মতিহার বাংলা ৬

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
www.bangladeptalumniru.org

মতিহার বাংলা ৬
৯ম বর্ষ ॥ ৬ সংখ্যা
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল
১৯ পৌষ ১৪৩১
০৩ জানুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো.নয়ন

শুভেচ্ছা মূল্য
১০০ টাকা

মুদ্রণ
দি সিটি অফসেট প্রিন্টার্স, তালাইমারী, রাজশাহী

ই-মেল
shiqbal70@gmail.com

যোগাযোগ
+৮৮০১৭১১২৬০৩৯০, +৮৮০১৭১৫৩১৯৩৬২

প্রকাশনা
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দুটি কথা

খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে ‘মতিহার বাংলা’ মুদ্রণের উদ্যোগ তৈরি হয়। কারণ, বর্তমান ‘সময়’। এতে চটজলদি লেখা দিয়েছেন প্রাক্তনিবৃন্দ। লেখাগুলোর ভেতর দিয়ে মূলত ব্যক্তির অভিব্যক্তিই ফুটে উঠেছে। বাংলা অ্যালামনাই’র একটা মুখশ্রী মুদ্রিত হয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনের কর্মপ্রণালী, এর ভাবনা কিংবা মনোভাবও এতে দৃশ্যমান হয়েছে। কিছু ভুলচুক আছে, সেটি টাইপিক্যাল মিসটেক্স। তা নিশ্চয়ই আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

‘মতিহার বাংলা’র উদ্যোগের প্রেরণা মূলত দুজনের– কবি জামিল রায়হান ও কবি আপেল আবদুল্লাহর। তাঁদের আত্মিক প্রণোদনা অ্যালামনাই সবসময়ই পেয়ে আসছে। তাঁরা ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে। তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই। এছাড়া নেপথ্যে থেকে অনেকেই কাজ করেছেন, সমর্থন যুগিয়েছেন। তাঁদের সবার প্রতি অপার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আপাতত, এগিয়ে যাওয়ার বাসনায় মানবতার জয় কামনা করি।

সকলে কল্যাণে থাকুন, কুশলে থাকুন।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই (২০২৩-২৪)র পক্ষে
শহীদ ইকবাল
সাধারণ সম্পাদক

গত জুলাই–অভ্যুত্থানে
শহীদদের স্মরণে

সূচি

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান-সূচি/৯
দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার পত্র/১০
শোকপ্রস্তাব/১১
সভাপতির কথা/১৩
সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য/১৫
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন/১৭

প্রবন্ধ
জুলফিকার মতিন/১৯
মানিকুল ইসলাম/২২

কবিতা
অনীক মাহমুদ/২৪
অর্বাক আদিত্য/২৫
আপেল আবদুল্লাহ/২৬
আহসানুল কবির/২৭
গোলাম কিবরিয়া পিনু/২৮
জামিল রায়হান/২৯
তানভীর দুলাল/৩০
তারিক-উল-ইসলাম/৩১
তুহিন আব্বাসী/৩২
ফজলুল হক তুহিন/৩৩
বেলায়েত হোসেন বাবলু/৩৪
মাহমুদ হাসান/৩৫
মোহাম্মদ মাহবুব আলম/৩৬
সুমন শাম্‌স/৩৭
সুমাইয়া খানম/৩৮
সদ্য সমুজ্জ্বল/৩৯

গল্প
সৈয়দ তৌফিক জুহরী/৪০

নিবন্ধ
মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন/৪৪

=====

বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন/৪৯
বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী/৫১
বাংলা গবেষণা সংসদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি/৫৩
বাংলা বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি/৫৫

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা
৩ জানুয়ারি ২০২৫

অনুষ্ঠানসূচি

প্রীতি সমাবেশ-রেজিস্ট্রেশন ও প্রাতঃরাশ ॥ সকাল ১০.০০টা
শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার টিএসসিসি প্রাঙ্গণ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ সভা ॥ সকাল ১১.০০ টা

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের নেতৃবৃন্দের অডিটরিয়ামে প্রবেশ ও মঞ্চে আসন গ্রহণ
সভার শুরুতেই **জুলাই-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারী শহীদ ছাত্র-জনতার স্মরণে**একমিনিট নীরবতা পালন ও বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের **সদ্যপ্রয়াত সদস্য/সহকর্মীদের**স্মরণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ

বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

ব্রাইনির ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
শহীদ ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নির্ধারিত এজেন্ডায় সভা শুরু

সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে মুক্ত আলোচনা ও প্রস্তাব উত্থাপন

সভাপতিত্ব করবেন

কবি জামিল রায়হান, সভাপতি, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সঞ্চালনায় : সাধারণ সম্পাদক, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অ্যালামনাই মেধাবৃত্তি প্রদান

মেধাবীদের উত্তরীয় প্রদান, ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান

মেধাবৃত্তি পাচ্ছেন

স্নাতক পর্যায় (২০২২) : সর্বোচ্চ নম্বরধারী তিনজন শিক্ষার্থী
স্নাতকোত্তর পর্যায় (২০২২) : সর্বোচ্চ নম্বরধারী চারজন শিক্ষার্থী

অ্যালামনাই-কর্তৃক বিজয়ী ফুটবলারদের ব্লেজার প্রদান

জুম্মা নামাজের বিরতি ও মধ্যাহ্নভোজ ॥ দুপুর ১২.৪৫-০২.৩০টা

কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ॥ বেলা ০২.৩০-০৫.০০টা

অংশগ্রহণে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সদস্য ও অতিথিবৃন্দ

সমাপ্তি ঘোষণা ও নাশতা গ্রহণ ॥ সন্ধ্যা ০৫-১৫ টা

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ নভেম্বর ॥ ২০২৪

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান

সম্মাননীয়

শুভেচ্ছা জানবেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের **দ্বি-বার্ষিকসাধারণ সভা** আগামী **৩ জানুয়ারি ২০২৫ শুক্রবার** অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী আয়েজিত এ অনুষ্ঠানের সকল কার্যসূচিতে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদ ও আন্তরিকতাসহ

(শহীদ ইকবাল)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই ॥ রাজশাহীবিশ্ববিদ্যালয়

সভার আলোচ্যসূচি

ক) পূর্ববর্তী-সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ (প্রচারিত)
খ) শোকপ্রস্তাব গ্রহণ
গ) নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন
ঘ) ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টি বোর্ড বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
ঙ) বাংলা বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মেধাবী শিক্ষার্থীদের অ্যালামনাই-বৃত্তি প্রদান
চ) আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগের রানার-আপ দলকে ব্লেজার প্রদান
ছ) বিবিধ

প্রেরিত :
ওয়েবপেজ ও অন্যান্য তড়িৎ মাধ্যম

শোকপ্রস্তাব

জীবনের অনন্তস্রোতে একপথে একরথে চললেও তোমরা মিলিয়ে গেছ শুকতারার আকাশে।
স্মরি তোমাদের। আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় তোমরা উজ্জ্বল, অবিনশ্বর।

[০২ মার্চ ২০২৪র **সাধারণ সভা**র পর আমরা যে-সদস্যদের হারিয়েছি]

নিশিথ কুমার ঘোষ
জীবন সদস্য ১৭১

মুনমুন দিল আফরোজ
জীবন সদস্য ৩২১

মো. আমজাদ হোসেন
জীবন সদস্য ৪৭৮

মো. আবু সাইদ চৌধুরী
জীবন সদস্য ১৯৬

মো. রেজাউল করিম
জীবন সদস্য ১৬৬

সভাপতির কথা

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর জাঁকজমকপূর্ণ চতুর্থ অ্যালামনাই উৎসব ও সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে অ্যালামনাসগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে পরবর্তী দুবছরের জন্য আমাকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এটা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের।দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই কয়েকদিনের ভেতরেই উপদেষ্টা পরিষদ ও পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

গঠনতন্ত্রের আলোকে একটি বিষয় বারংবার আলোচিত হয়েছে,অ্যালামনাইয়ের বিভাগীয় কমিটি গঠন।কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা যায়নি।কিন্তু আমাদের কমিটি গঠনের পর এটাই ছিল অগ্রাধিকার তালিকায়। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগীয় কমিটি গঠন করতে সমর্থ হই।দুটি কমিটি গঠনের পর সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করে।পারস্পরিক সহযোগিতায় নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।এ বছরের মার্চে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় যার প্রতিফলন লক্ষণীয়ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় একই সময়ে খুলনা বিভাগীয় কমিটিও গঠিত হয়।দুঃখজনকভাবে সত্যি যে,কয়েকদফা উদ্যোগ নিয়েও রংপুর বিভাগীয় কমিটি গঠন সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।আশা করি,এই বিভাগীয় কমিটিও হয়তো খুব নিকট ভবিষ্যতে আলোর মুখ দেখবে।ফলে,আমাদের এতদ্‌বিষয়ক লক্ষ্যপূরণে পূর্ণ সফলতা দাবী করতে পারবো।

ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগীয় কমিটি দুবছরের কার্যক্রমের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বর্ণিল অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনকে চাঙা করে তুলেছে।ঢাকা বিভাগীয় কমিটির সকল সদস্য বিশেষ করে সভাপতি এলিনা খান ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি সভাপতি তবিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে সফলভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।খুলনা কমিটিও নতুন কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে,যার ফলাফল অচিরেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে।

বিভাগীয় কমিটির সকল সদস্যকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়ে বেশ কয়েকটি সেমিনার ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করি, শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা আগামীর কর্মপন্থা নির্ধারণে কিছুটা দিক-দিশা লাভ করেছেন। এটা আগামীতেও চলমান থাকবে বলে আশা রাখি।

একটি বিষয় আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের উদ্যোগে বেশ কয়েকজন সদস্যের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় একলক্ষ টাকার বই কিনে বাংলা বিভাগ সেমিনারে প্রদান করা হয়েছে এবং সেমিনার কক্ষে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই কর্নার স্থাপিত হয়েছে। এ কার্যক্রমে সাধারণ সম্পাদক, প্রফেসর শহীদ ইকবাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমাদের সদস্য-সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং যা ইতোমধ্যে সাতশো ছাড়িয়ে গেছে, এটা সাফল্যের আরেক দিক। একই কারণে সদস্যগণের রেজিস্ট্রেশনের অব্যয়যোগ্য অর্থ সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা আশা করেছিলাম এই জমাকৃত অর্থ তিরিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করতে পারবো। হয়তো সামনে কিছুদিনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

হতাশার দিকটি হলো, সাফল্যের সব সূচক অর্জন সম্ভবপর হয়নি। বিশেষ করে পঞ্চম অ্যালামনাই উৎসব যথাসময়ে না-করতে পারার ব্যর্থতার দায়ভার এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা অনুকূল না-থাকায় পূর্বঘোষিত ডিসেম্বর ২০২৪ এর ২৭ তারিখে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এই অনিবার্য কারণ নিশ্চয়ই প্রজ্ঞাবান অ্যালামনাসগণ সুবিবেচনায় রাখবেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের কমিটির মেয়াদ ইতোমধ্যে দুবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রয়োজনীয় ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অ্যালামনাইকে আরও গতিশীল ও সুদূরপ্রসারী করে তুলতে সকলে সচেষ্ট হবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হোক– সবার জন্য রইলো একরাশ উষ্ণ শুভেচ্ছা।

জামিল রায়হান

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

সকলকে শিশির-সিক্ত শেফালিফুলের শুভেচ্ছা–

নিশ্চয়ই কুশলে আছেন সকলে।

আজকের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার মান্যবর সভাপতি, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রিয় প্রাক্তনিগণ

আমাদের এ সম্মিলন আনন্দের। এই আনন্দ আরও উৎফুল্লপূর্ণ এবং মুখরিত হতে পারতো কিন্তু দেশ-জাতির বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে, শৃঙ্খলার বিধান চলমান রাখতে– এমন-একটি সাধারণ সভার আয়োজন করতে হয়েছে।প্রকৃতপক্ষে এটি সম্মেলনের পরিবর্তে একটি অন্তবর্তীকালীন সাধারণ-সভা। আমরা অবশ্যই আশা করি আগামীতে আরও সুন্দর ও শুভময় সময়ের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো। এবং আসন্ন প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অর্জন করতে পারবো। যা হোক, এই সাম্মিলনিক-সাধারণসভায় আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের বয়স নয় বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। এখন এ-সংগঠন একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাংগঠনিক ও আর্থিক শক্তি দুটোই লক্ষ্যনির্ধারিত এবং সেভাবেই এর কাজ এগিয়ে চলছে। এজন্য সকল সদস্যের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের(২০২৩-২৪) কার্যনির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব নেয়–২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর চতুর্থ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের ভেতর দিয়ে। এরপর এ-কমিটি গত মার্চ মাসে একটি সাধারণ সভা করেছে এবং নয়টি কার্যনির্বাহী সভা করেছে। এইসব সভার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজ ও কর্মপদ্ধতি হাতে নিয়েছে। আমরা সময়ে সময়ে ওয়েবপেজে, ফেসবুকপেজে কিংবা পত্র ও প্রকাশনার মাধ্যমে আপনাদের তা জানিয়েছি। সাংগঠনিক সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখে আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি। আপনাদের হাতে আজকে যে ক্ষুদ্র সুভেনির আছে সেখানে বিগত সাধারণ সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত হয়েছে। তাই, সেসব কথার পুনরাবৃত্তি না-করে বিগত নয়মাসে আমাদের কী কী কাজ করেছি বা হতে নেওয়া আছে সেগুলো সম্পর্কে দুএকটা কথা এখানে বলতে চাই। অবশ্য আজকের সভার যে আলোচ্যসূচি (সুভেনিরে মুদ্রিত) সেগুলো আমাদের অগ্রগামী কাজেরই সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

আমরা পরিমার্জিত ও সংশোধিত গঠনতন্ত্র মুদ্রণ করেছি। এ-মুদ্রণে সর্বাত্মক সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। আমাদের ওয়েবপেজটি অত্যাধুনিক করে আপডেটেড করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুতই সম্পন্ন হবে। একটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট করার প্রস্তাব এসেছে। সেটি হলে আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও আস্থার দৃঢ়তা বাড়বে। আমাদের নতুন সদস্য বেড়েছে। ঢাকা কমিটি, রাজশাহী কমিটি এবং খুলনা কমিটি এ ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত যে, ঢাকা কমিটি নানারকম অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমাদের অ্যালামনাইয়ের প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে। একইভাবে রাজশাহী কমিটির সদস্যরাও সদস্য-সংগ্রহ অভিযান থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক আয়োজন করেছে। আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সময় ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছি। বাংলা বিভাগের সেমিনারে এক লক্ষ

টাকার বই প্রদান করা হয়েছে এবং একটি কর্নার স্থাপিত হয়েছে। এ-অর্থ নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখনীয় যে, মোহাম্মদ মাহবুব আলম পঞ্চাশ হাজার টাকা এককভাবে এঅনুদানে যুক্ত করেছেন। ঠিক একইভাবে বাংলা বিভাগের খেলোয়াড়দের ব্লেজারও দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরকম বছরব্যাপী নানাবিধ কার্যক্রম চলেছে এবং তা ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে।

আমরা আরও কাজ করতে চাই। সংগঠনে নতুন নেতৃত্ব চাই। আজকের এই সাধারণসভায় যে নতুন নেতৃত্ব আসবে তার ভেতর দিয়ে অ্যালামনাই আরও বেগবান ও সমৃদ্ধ হবে। আমরা সকলে মিলে সাংগঠনিক স্বার্থটি সমুন্নত রাখতে চাই। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে আমাদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমরা অনেক কাজ পুরোপুরি করতে পারি নাই। আমাদের সাফল্যের দিকে যেমন সন্তুষ্টি আছে তেমনি কিছু কাজ সম্পন্ন করতে না-পারার ব্যর্থতাও আছে। আশা করছি, আগামীতে সেগুলো সম্পন্ন করার পথ প্রসারিত হবে।

আঁধার ঘুচুক– কাটুক অন্ধকার। আমরা এগিয়ে যাই। সকলের সাফল্য ও মঙ্গলময় জীবন কামনা করি।

শহীদ ইকবাল

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

সম্মানিত সভাপতি ও সুপ্রিয় অ্যালামনাসবৃন্দ

শীতের এই সকালে উষ্ণ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

জানুয়ারি ২০২৩ আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা ব্যয় সংকোচন করে অ্যালামনাইয়ের কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার চেষ্টা করেছি। আমাদের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ মিটিং এবং অন্যান্য কার্যক্রমের আপ্যায়নের দায়িত্বটি– সভাপতি, বাংলা বিভাগ ও সাধারণ সম্পাদক বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই শহীদ ইকবালের সৌজন্যে সম্পাদিত হয়েছে।
দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠায় অনেক শুভার্থীর পরামর্শে ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে এবি ব্যাংক রাজশাহী শাখায় সংরক্ষিত তিনটি এফডিআর (একুশ লক্ষ, আড়াইলক্ষ ও আড়াই লক্ষ) ভাঙিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রাইম ব্যাংক রাজশাহী শাখায় স্থানান্তর করা হয়। এবি ব্যাংক রাজশাহী শাখায় তিন কিস্তিতে সংরক্ষিত ছাবিবশ লক্ষ টাকার লভ্যাংশ দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশ উনিশ দশমিক আটানব্বুই টাকা প্রাইম ব্যাংক রাজশাহী শাখায় ব্যয়যোগ্য হিসেবে রাখা হয়েছে। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেগত ৩১ ডিসেম্বর২০২৪ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের বিবরণী এখানে উত্থাপন করছি :

ক) **দায়িত্বগ্রহণেরসময় অব্যয়যোগ্য হিসেবে প্রাপ্ত**

১। অগ্রণী ব্যাংক রাবি শাখা (হিসাব নং ০২০০০০২২৬২০৯৩)= ২৭১৫৩০.৯০ টাকা
২। এবি ব্যাংক রাজশাহী শাখার এফডিআর= ২১,০০০০০টাকা

খ) বর্তমান স্থিতি

১। অগ্রণী ব্যাংক রাবি শাখা (হিসাব নং ০২০০০০২২৬২০৯৩)= ৪১৫৩.৯৩ টাকা
২। প্রাইম ব্যাংক রাজশাহী শাখায় এফডি আর = ২৬,৫০০০০টাকা

গ) !)**দায়িত্বগ্রহণ : ব্যয়যোগ্য হিসেবে প্রাপ্ত**

১। অগ্রণী ব্যাংক রাবি শাখা (হিসাব নং ০২০০০০৭৬৬০০৫১)= ১,১৩ ০১৩.৯৭ টাকা
২। ২মার্চ ২০২৪ বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে আয় (২২২ জন্য সদস্যের ৫০০টাকা করে নিবন্ধন)=১১১০০০ টাকা
৩।জনাব এস এম সাইদুল আম্বিয়া (সকালের খাবার) = ১০০০০ টাকা
৪। দুপুরের খাবার শহীদ ইকবালের সৌজন্যে
৫। বিকেলের নাশতা আবদুল খালেক মিঠু প্রদত্ত =১২০০০ টাকা
৬। এবি ব্যাংক রাজশাহী শাখা হতে এফডিআরের প্রাপ্ত লভ্যাংশ= ২৭৬৩১৯.৯৮টাকা

মোট = **৫২২৩৩৩.৯৫ টাকা (আয়)**

গ) !!)

১। ২মার্চ ২০২৪বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যয় মোট =১০৬৫০০ টাকা
২। ঢাকায় আবুবকর সিদ্দিকের স্মরণসভায় (২৬ জানু. ২০২৪) = ৪৩০০০ টাকা
৩।ইফতার মাহফিল, ডোমেইন (দুই বার নবায়ণ), ফোন মেসেজ, ব্যানার ও অন্যান্য বাবদ মাহবুব=৩২৫০০ টা
৪। রাজশাহীতে সেমিনার, আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠানাদি বাবদ =১৬৯০০ টাকা
৫। ছাত্রদের দক্ষতা-উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায় ক্রেস্ট, ব্যানার ও আনুষঙ্গিক খরচ=৫৯৫২ টাকা
৬। এফডিআরের জন্য ব্যয়যোগ্য থেকে অব্যয়যোগ্য ফান্ডে স্থানান্তর = ৫০০০
৭।পরিমার্জিত গঠনতন্ত্র মুদ্রণ = ২০০০০ টাকা

মোট = **২২৯৮৫২ টাকা (ব্যয়)**

ঘ) ব্যয়যোগ্য হিসেবের বর্তমান স্থিতি

অগ্রণী ব্যাংক রাবি শাখা (হিসাব নং ০২০০০০৭৬৬০০৫১)=২০১৮৬.৯৭ টাকা
প্রাইম ব্যাংক রাজশাহী শাখা =২৭২২৯৪.৯৮ টাকা

উপর্যুক্ত আয়-ব্যায়ের হিসাব-বিবরণী আপনাদের সহৃদয় অবহিতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করলাম।

ব্রাইনির ইসলাম

● প্রাক্তনীদের লেখাপত্র

জুলফিকার মতিন

বুদ্ধিজীবীগণ ও আমাদের বাস্তবতা

বুদ্ধি সব মানুষেরই আছে। আপেক্ষিকতার কারণে, আমরা বলি, কারও কম; কারও বেশি। কিন্তু বুদ্ধি তো আছে। এবং তা থাকতেই হবে। কেননা, বুদ্ধি হল প্রকৃতি জগতে নিজের অস্তিত্বকে প্রবহমান রাখার জন্য বিকল্পহীন মৌলিক অস্ত্র। আমাদের যে সভ্যতা, তা তো প্রযুক্তি নির্ভর। এই প্রযুক্তি গড়ে ওঠে বুদ্ধিবৃত্তিরই বিকাশের দ্বারা। প্রকৃতিকে জয় করেই বলি, আর ধ্বংস করেই বলি গড়ে উঠেছে এই সাধের(!) সভ্যতা। দালানকোঠা-প্লেন-ট্রেন-কম্পিউটার– এসবের কথা ছেড়েই দিলাম, যেভাবে শুরু হয়েছে মহাকাশ অভিযান, তাতে মানুষ, চাঁদ তো চাঁদ, নীহারিকা পথেও বৈকালিক ভ্রমণ সারতে চাচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখুন প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। জন্মদিনের পোশাকই ছিল মানুষের একমাত্র পোশাক। ঘুরে বেড়াত বনে-জঙ্গলে। খাদ্য ছিল পশু-মাংস। সেটাও যোগাড় করা ছিল না সহজ ব্যাপার। একটা মাছি ধরতে কিংবা মশা মারতেই মানুষের অবস্থা প্রাণান্তকর। সেখানে বাঘ-সিংহ-গেরিলা-বরাহ শিকার করা কি সাধ্যাতিরিক্ত ব্যাপার? শারিরীক শক্তিতেও সম্ভব ছিল না তাদেরকে আয়ত্তে আনার। কিন্তু মানুষ তো বুদ্ধিমান প্রাণী। তাদের সেই বুদ্ধির চাষ যখন শুরু হলো, তখন দেখল, কাছে গিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গেলে তো প্রাণ সংশয়। তার চেয়ে দূরে থেকে যদি পাথর ছুঁড়ে মারা যায়, তবে ঘায়েল করা যেতে পারে যেন তেন ভাবে। তারপর একদিন বুঝতে শিখল, পাথরটা ভেঙে, যদি সূচাল করে নেয়া যায়, তবে কাজটা হয়ে যায় আরও সহজ। আবার শীত, তাও ভয়াবহ। ভালুকের গায়ে জমকাল পশম। তার তো কিছু হয় না। যদি তার চামড়াটা ছাড়িয়ে নেয়া যায়, তবে গায়ে জড়িয়ে সে সমস্যারও হতে পারে সমাধান। এভাবেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই একদিন শুরু করেছিল বৈরী প্রকৃতি জগতে পথ চলা।

এর পর তো মানুষ পরিবার গড়েছে, সমাজ গড়েছে, গড়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এগুলোর একটা ব্যবহারিক দিক আছে। রুশোর কথাটা বললে, বোধ করি, আমার কথারও গুরুত্ব বাড়বে। মানুষ জন্মগ্রহণ করে স্বাধীন হয়ে। কিন্তু জন্মাবার পর থেকেই সে শুরু করে পরাধীন হতে। যে পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করে, তাকে সেই পরিবারের খাদ্যদ্রব্যাদি– পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে ভাষা-ধর্ম-আচার-ব্যবহার সবকিছুর অংশীদার হয়ে পড়তে হয়– এমনকি– তার চিন্তা-ভাবনারও। সামাজিক মূল্যবোধ– ধর্মীয় মূল্যবোধ আহরণ করতে হয় এগুলোও। রাষ্ট্র আইন করে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে করণীয় ও অ-করণীয় কর্তব্য করে দেয় নির্ধারণ। এ সব কিছুকেই আমরা আমাদের জীবনযাত্রার ব্যবহারিক দিক বলে মেনে থাকি। আর এটাও ঠিক, এভাবে এই পরাধীনতা যদি আমরা অনেকটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে গ্রহণ না করতাম, তবে সৃষ্টি হত একটা নৈরাজ্যিক শূন্যতার।

তবে মানুষের যেমন বস্তু জগৎ আছে, তেমনই রয়েছে তার ভাব জগৎ। তারও ভূমিকা সমান সমান। সেখানেই, যে সব মূল্যবোধের কথা, যথা, সামাজিক মূল্যবোধ– ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির কথা আমরা বলে থাকি, সেগুলোও এই ভাব জগতেরই অঙ্গীভূত বিষয়। আর একটি বিষয় হল, পুকুরে যেমন শ্যাওলা-কচুরীপানা– নানা আবর্জনা রাশি জমতে জমতে পানি পচে পচে ভয়াবহ দুর্গন্ধময় অকহিতব্য উপাদানে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে, মানুষের সমাজ প্রবাহেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। কুসংস্কার তো বটেই, অমানবিক দৃষ্টান্তও অহরহ পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজেও দেখা গেছে সতীদাহ প্রথা কিংবা

বিধবা বিবাহ না দেয়ার মতো অমানবিক বিধান ধর্মীয় বলে গৃহীত ছিল। তৎকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল নানা কুসংস্কার। কিন্তু মানুষের সমাজ তো চিরচলিষ্ণু– সদা প্রবহমান। অচলায়তনে বাঁধা পড়ে থাকা তো তার ধর্ম নয়। পুকুরে যেমন দুর্গন্ধময় আবর্জনারাশি দূরীকরণের জন্য নতুন পানির প্রয়োজন পড়ে। সমাজ দেহে পরিবর্তনের জন্যও তেমনই অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে নতুন চিন্তার। অগ্রসরমানতার আত্যন্তিক তাগিদেই উন্মেষ ঘটে নতুন চিন্তার। আর ভাবগত ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা দ্বারা যারা এই কাজটি করে থাকেন, বোধ করি তাদেরকেই আমরা বুদ্ধিজীবী বলতে পারি। এক সময় সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটলেরা এ কাজ করেছেন। পরবর্তী কালেও আরও নানা মনীষী-দার্শনিক-চিন্তাবিদেরা করেছেন। তাঁরা আমাদেরও খুবই সুপরিচিত।

কাজেই, সমাজে বুদ্ধিজীবীদের কি ভূমিকা, তা বোধ হয় পরিষ্কার করতে পেরেছি। আরও যেটা কথা তা হল, উৎপাদন সম্পর্কের বৈষম্য থেকে প্রচলিত সমাজে গড়ে ওঠে সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীই হয়ে দাঁড়ায় সমাজের নিয়ন্ত্রক। শাসন আর শোষণই হয় তাদের মূল কাজ। সমাজটাও হয়ে পড়ে স্থবির। আর এই স্থবিরতা দূরীকরণের জন্য বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই উন্মেষ ঘটে নতুন চিন্তা চেতনার– যা সুবিধাভোগী বা শাসক-শোষক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিবন্ধক। তখনই নেমে আসে বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন। শেষ পর্যন্ত তা বুদ্ধিজীবীদের দাঁড় করিয়ে দেয় হত্যার মতো নৃশংসতার মুখোমুখি।

আমাদের দেশেও মুক্তিযুদ্ধের সময় তাই হয়েছিল। একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পাকিস্তানের। আর একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে ধর্ম কখনোই আধ্যাত্মিক মহিমায় উদ্ভাসিত হয় না। বরং তার আনুষ্ঠানিক বিষয় ও উপাদানাদিও দৃষ্টিকটু প্রদর্শন প্রাণহীন রীতি ও পালনের বস্তুতে হয় পরিণত। পাকিস্তানেও তাই হয়েছিল। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার। আর সেজন্য প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল প্রতিবেশী হিন্দুদের ধর্ম ও আচরণ। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা বাঙালী হিন্দুদেরও মাতৃভাষা বলে, তাকে আখ্যা দেয়া হয়েছিল হিন্দুয়ানী। শুধু হিন্দুয়ানী বলে অপব্যাখ্যা দেয়া নয়, বাংলা ভাষাকে নির্মূল করার জন্য এলান এসেছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার। এখন বাঙালী মুসলমান হোক আর হিন্দু হোক, বাঙালী জাতির উদ্ভব আর বিকাশ সম্প্রসারিত হয়েছে তার মাতৃভাষা বিকাশেরই সাথে সাথে। তাই বাংলা ভাষাকে বিনষ্ট করার অর্থই হলো বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করা। আর ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, সাক্ষাৎ আন্দোলন ছাত্র সমাজই করেছিল, কিন্তু পাশাপাশি আমাদের বুদ্ধিজীবী-চিন্তকেরা পাকিস্তানী এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রতিহত করার জন্য তৈরী করেছিলেন ভাবজগৎ। তখনকার জ্ঞানতাপস মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কিংবা আরেক মনীষী মুহম্মদ এনামুল হকের লেখা পড়লেই, তা বোঝা যায়। একুশে ফেব্রুয়ারীর বিস্ফোরণ ও আত্মদানের পরের বছরই শিল্প-সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হতে দেখি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে। সেই সময়েরই লেখা আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি', এখনও তো আমরা গাই।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে আমরা নতুন করে শিকার হই জাতিগত নিপীড়নের। নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই প্লাটফরম হিসেবে, আমরা পেতে থাকি অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের। জাতীয়তাবাদের কথা শুনলেই এক দল অতি ইনটেলেকচুয়াল নাক চেপে ধরেন। এটি আসলে তাদের আত্মপ্রতারণাই বটে। কেন না, আমরা যতই আন্তর্জাতিকবাদের কথা বলি, আর সর্বহারার রাজত্ব স্থাপনের কথাই বলি, কিন্তু মানুষের এথনিক অরিজিন থেকে যে 'রেস' কিংবা জাতি, সারা বিশ্বে সেটাই প্রবল। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আরবীয়রা, কিংবা ইরানীরা কিংবা ইরাকীরা, কিংবা তুর্কীরা, – কারা জাতিত্ব বিসর্জন দিয়েছে? বরং

যুদ্ধবিগ্রহে– হানাহানিতে রক্ত বর্ণ করে রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ। চৌদ্দ জাতির গুষ্ঠী উদ্ধার করে, মার্কিনীরাও এখন এক জাতি হয়ে উঠতে চাচ্ছে। তারাই আবার তত্ত্ব বিক্রি করছে জাতীয়তাবাদের শ্রাদ্ধ করে।

যা হোক, পাকিস্তান আমলে এ দেশীয় আন্দোলন সংগ্রামের মূল শক্তি হিসেবে ভিত্তিভূমি দাঁড় করিয়েছে তখনকার বুদ্ধিজীবীরা। সমকাল পত্রিকাই বলি, আর আবদুল হকের প্রবন্ধের কথাই বলি, আর মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের কথাই বলি– সে সবের দ্বারাই তৈরি হয়েছে আমাদের ভাবজগৎ, আসলে যা ছিল পাকিস্তানী রাষ্ট্র দর্শনের বিরোধী। শিল্পসাহিত্যের কথাই বলি, আর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের কথাই বলি– তাদের সৃষ্টিশীলতার বাস্তব প্রয়োগই ঘটেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যার দ্বারা। তাই, এই ভাব জগৎ যাতে তৈরি হতে না পারে– বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দ্বারা সমাজ যেন আলোকিত না করে সেজন্যই বুদ্ধিজীবীরা প্রতিরোধের মুখে পড়েন, সময়ে সময়ে।

এটা ঠিক, সময় পাল্টে যায়, সমাজ বদলায়। বদল ঘটে মানুষের চাহিদারও। সুতরাং যে প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানী আমলে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা দেখেছি, তেমন আর নেই। নতুন একটা বাস্তবতার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। দালান-কোঠা-ইমারতরাজি পরিদৃশ্যমান, কিন্তু তার ভেতর প্রাণপ্রাচুর্য কতটুকু। রাস্তা–ঘাট বানান হচ্ছে, যানবাহনও প্রচুর, কিন্তু গন্তব্য কোথায়? অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা নাইবা বললাম, কিন্তু সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,– বিশ্ববিদ্যালয়? সত্যি বলছি আমি জানি না তার সংখ্যা কত? এই শিক্ষার লক্ষ্যইবা কি? আর সংখ্যার হিসেব দিয়ে তো মেধা-প্রতিভার পরিমাপ হয় না। তাই, সেখানে যে কি হচ্ছে, তা কি আমরা ভাবছি? আবার মেধা-প্রতিভা কিভাবে মার্কেট অরিয়েন্টেড হয়, তাও অন্তঃপক্ষে, আমার তো জানা নেই। সেজন্য মনে হয়, আমাদের যারা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় নিরত আছেন, তারা, রোগ নয়, রোগের উপসর্গ নিয়ে ব্যাপৃত আছেন। চুরি-চামারি হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, উৎকোচ-পারিতোষিক স্তূপাকার হয়ে পড়ছে– দুর্নীতির শেষ নেই,– এই বলে বলে আমরা আহাজারি করছি। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে এর প্রকৃত কারণ কোথায় লুকিয়ে আছে, সেটা দেখার দরকার যেন আমাদের নেই। অনৈতিকতা একটি বড় সমস্যা। আমরা তো স্কুল থেকেই ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি। কিন্তু এই ধর্ম শিক্ষা যারা নিচ্ছে, শিক্ষিত হয়ে তাদেরই একটা অংশ বড় অধার্মিক হয়ে পড়ছে। কাজেই কেবল মুখস্থ করিয়ে দিলেই যে লোকে ধার্মিক হয়, তা তো নয়। আসলে ভোগবাদী সমাজের যে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, তাই বাড়িয়ে দিচ্ছে অনৈতিকতাকে। সেজন্য নতুন পথের সন্ধান আমরা করছি কি?

সুতরাং তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। মূল বিষয় যেটা, তা হল, বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে নতুন চিন্তার উন্মেষ হচ্ছে না। যে চিন্তার অনুশীলনের ভেতর দিয়ে জাতির প্রাণতৃষ্ণা জাগ্রত হবে। তাকে ধাবিত করবে নতুন সৃষ্টির পথে। সেটা যে হচ্ছে না, তাই আমাদের এখনকার বুদ্ধিজীবীদের বড় ব্যর্থতা। রুশো-ভলটেয়ারের লেখা একদিন ফরাসী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাস্তিল কারাগার ভাঙতে। জানি না, এখন তেমন কবে হবে?

মানিকুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই– প্রসঙ্গ-কথা

> Alumni Association is an organization composed of former students of university especially tertiary level (Graduate & post-Graduate). Promoting alumni engagement and supporting institutional goals.

পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রায় শুরু থেকেই অ্যালামনাই কার্যক্রম চালু করেছে– মূলত কতোগুলো বিষয় ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে– পঠন-পাঠন, প্রায়োগিক শিক্ষা-ব্যাবস্থা, উৎপাদনমুখী গবেষণা, শিক্ষা-উপকরণের যথাযথ পর্যাপ্ততা– প্রভৃতি আনুষাঙ্গিকের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের মেধা-শ্রমের যৌথ প্রযোজনায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ-কাঠামো, মানবকল্যাণধর্মী প্রযুক্তিনির্ভর একটি বাস্তবমুখী জনসম্পদ বিল্ড-আপ করা। এখানে পাস করে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আজীবন-বন্ধন বা যোগাযোগ অটুট রাখা। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যে ভূমিকা– দক্ষতা এবং এন্ট্রাপ্রেনিউর অবস্থান, ইনোভেটিভ চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি প্রতিনিয়ত প্রসব করে চলেছে প্রথমদিকে এ-রকম ধারণা থেকেই মূলত অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ব্যবস্থার প্রবর্তন বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই সংগঠন হয়ে ওঠে– বিশেষভাবে পৃথিবীর খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নত গবেষণা-কার্যক্রমের ফান্ড সরবরাহকারী, গ্রাজ্যুয়েটদের কর্ম-পরিধি বাড়ানো, ইমপ্লোইজ নিয়োগে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের গ্রাজ্যুয়েট, পোস্ট-গ্রাজ্যুয়েটদের প্রতি দায়বোধ এবং শিক্ষার্থীরা কর্মসংস্থানে কীভাবে দক্ষ ও যোগ্যতর প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারে তৎসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তৈরিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক যুগোপযোগী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসিপ্লিন গড়ে উঠে তার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার চালিকাশক্তিরূপে। অ্যালামনাই একটি বিভাগের সম্পূরক বা পরিপূরক সংগঠন। প্রয়োজনে বিভাগকে উন্নত করা, বিকশিত করা এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদানে এই সংগঠনটির দায়-দায়িত্ব অনস্বীকায। আমরা দেখি অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, স্ট্যানফোর্ড, মোনাস, এমআইটি, ইয়েল, প্রিসটন, বার্কলে প্রভৃতি সুনামধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই সংগঠন ও অ্যালামনাসরা কীভাবে নিরন্তর উপর্যুক্ত দায়বোধ ও ভালোবাসা প্রদান করে চলেছে, এবং তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব মেধা-মনন এবং অর্থ-সহযোগিতায় করে তুলেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমাদের প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মতিহারের হরিৎভূমিতে। বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ছয়টি বিভাগের একটি। ১৯৫৪-১৯৫৫ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমে এই বিভাগ তার পঠন-পাঠনের যাত্রা শুরু করে। এই বিভাগকে গর্বিত করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ– যার অন্যতম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান প্রমুখ।

বাংলা বিভাগের পাসকৃত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের স্বনামধন্য সরকারি, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। অনেকে নিজস্ব গড়ে তোলা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এসব কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির গতি-আনয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়াও বহু অ্যালামনাস বিভিন্ন দেশে তাদের সম্মানজনক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই একটু বিলম্বে পথ চলা শুরু করলেও ৮-৯ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে

প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠানটি করে। ইতোমধ্যে বিভাগ ও বিভাগের বাইরে বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই তাদের অবদান রেখে চলেছে। প্রতি দুবছর পর পর মতিহার সবুজ চত্বরে রানিং শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাসরা মিলিত হয়ে তাদের সম্পর্ক-উন্নয়ন, কানেকটিভিটি ডেভেলাপ করে থাকে। এবং বাংলা বিভাগের মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি, প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে তাদের বলিষ্ঠ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রত্যাশা– বাংলা বিভাগের পাশে থেকে এবং বিভাগের শিক্ষক, চেয়ারম্যান ও অ্যালামনাসদের পরামর্শে বিভাগের কারিকুলাম, এক্সপানশন, গবেষণায় নিয়মিত ফান্ডিং সরবরাহ ও চলমান শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণাসহ আর্থিক সহযোগিতায় বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই যথারীতি পালন করে চলবে এবং একে সম্মুখদিকে এগিয়ে নেবে। যাতে এই বিভাগ দেশ-বিদেশে সম্মান ও মর্যাদা যথোচিত অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। বিভাগের এই সমুন্নত মর্যাদা বজায় রাখতে আমাদের সকল স্টেক-হোল্ডারকে একসঙ্গে, একযোগে কাজ করতে হবে।

সকলের কল্যাণ মানেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই– যা বস্তুত অ্যালামনাস-ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক একই সুতোয় গাঁথা একখানি পুষ্পমাল্য।

জয় হোক সকলের– বাংলা বিভগের তো বটেই।

অনীক মাহমুদের যুগল পদ্য

‘১’

পথের ওপাশে

পথের ওপাশে আরো ছিলো মায়াবতী ঋদ্ধ পথ,
সন্নিধান জড়ো করে দেখাতে চেয়েছি দীপ্ত আলো,
কখনো নিয়েছি একা নিষ্ঠাবান সারথি শপথ,
জারুল মহুয়া বনে স্ফিত রোদ ছিলো জমকালো;
উড়াল শিখলো কেউ যশোবন্ত সুখের কপোত,
মাঙ্গলিক সুরে সুরে কারো কণ্ঠে জমা হলো ভালো,
সাধনার মর্মমূলে কেউ হলো দীপ্ত অধিরথ।

যাদের মহিমা নিয়ে ছায়াবৃত এমন জীবন,
কষ্টি কোন পাথরের ঘষা সেখানে বাড়ায় হেম,
দৃষ্টি মেলে অনেকেই পেয়ে গেলো আলোর রণন–
সাধনা ও সিদ্ধিলোকে জমা করে মরমিয়া প্রেম;
পথের ওপাশে প্রিয় সর্বকান্তি রাখালিয়া গীতি,
শেষ পারাণির কড়ি অনিঃশেষ বিদায়ের প্রীতি।

‘২’

মনে রেখো

আমিও তোমার মতো স্বপ্নঘোরে ছিলাম একান্তে,
এই রূপশালী মতিহারে সবুজের বৃক্ষধামে.
জনান্তিকে কতো কথা গেঁথে গেছি সুবিমল প্রান্তে,
ঘুমে গেছে কতো তারা একা ডাইনে ও বামে,
এলোকেশী নিসর্গের বৈকালিক অধরা সীমন্তে
আবেগার্ত শব্দমালা এলো গেলো বাদামিয়া খামে,
পুষ্পিত হৃদয় ছিঁড়ে কেউ হলো উদাসী দিনান্তে,
মাটি হলো খড়িমাটি সোঁদা ঘ্রাণে আজো দেখি ঘামে।

কেবলি রকম ফের সময়ের নতজানু কায়া,
একিভাবে পড়ে যায় আপ্তবাক্য শুনে শুনে সেকি!
দীর্ঘ হয় রৌদ্রভানু হেলে দুলে সুনিবিড় ছায়া,
মনে রেখো, সত্যনিষ্ঠ চোখ হয়নাকো মেকি;
পশ্চাতের নিত্যদিন সামনের অযাচিত ভোর,
জ্ঞানবতী মতিহার ভুলি নাই স্নিগ্ধ মায়াডোর।

অর্বাক আদিত্যের কবিতা

আবরার, স্বৈরাচারের হাতে নিহত

রাষ্ট্র মাত্রই সরকার আর সরকার মাত্রই স্বৈরাচার
রাষ্ট্র মাত্রই কেরানী উৎপাদনের কারখানা
রাষ্ট্র মাত্রই বাধ্যগত দাস উৎপাদনের কারখানা
এদেশের সচিবালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কেরানীতে ভরে গেছে
কেরানীদের খেতে বললে খায় বলতে বললে বলে হাঁটতে বললে হাঁটে
সরকার মাত্রই কেরানীদের নিয়ন্ত্রক কেরানী মাত্রই স্বৈরাচার!
ছাত্রদের ওপর জুলুম করে কৃষকের ওপর জুলুম করে
বিরুদ্ধ মতের ওপর জুলুম করে
প্রথমত শাসায় দ্বিতীয়ত আহত করে তৃতীয়ত হত্যা করে
স্বৈরাচারী বিধানে ক্ষমতা মাত্রই অন্ধকার
অন্ধকারে বন্দুকের নল যে কারো বুকে আঘাত হানার অধিকার রাখে
অন্ধকারে সততার বানী আওড়ালে আপনাকে দেশ ত্যাগ করতে হবে
আন্দোলন করলে নিষিদ্ধ করা হবে
দেশবিরোধীদের কথা বললে পিটিয়ে হত্যা করা হবে
রাষ্ট্র মাত্রই সরকার, সরকার মাত্রই ক্ষমতা
ক্ষমতা মাত্রই মৃত্যুর উল্লাস
মৃত্যু মাত্রই স্বৈরাচারের হাতে নিহত চাপা ক্রন্দন!

আপেল আবদুল্লাহর কবিতা

সাদামাটা ভাবনা

শিল্পে কিছু মিথ থাকে, অর্ধসত্য, কল্পচিত্রলেখা
ন্যাকামি ভাষায় কারা যেন টোপ ফেলে যায়
সাদামাটা চোখ হয়ে যায় সমুদ্র ক্যানভাস
তোষামোদের পুরানো চেনা ছক এতো ম্যাড়ম্যাড়ে
ফাঁকির চাষবাস সব নিষ্ফলা ফিকে জোলো হয়ে যায়
কে যেন লিখেছিলেন–
ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?
তিনি কেন তবে প্রিয়ার চুলে বিদিশার নিশা দেখেন?
কেন অন্য কবি বলেন–
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার

কবি রফিক আজাদ প্রায়শই বলতেন–
মহান ভণ্ডরা যখন সভায় ভাবগম্ভীর বাণী দেন
তখন আমার কেবল হাসি পায়,
হাত নিশপিশ পা সুড়সুড় করে
মনে হয় চাবকানো দরকার
কিন্তু পারি না আমিও অংশ হয়ে যাই
তবে একটু গলা ভিজিয়ে না নিলে
মেকি শিল্পগুলো-সত্যগুলো আমার জবানে আসে না।

আহ্সানুল কবিরের কবিতা

রোহিণী নক্ষত্রে যাবো

বিবাহের মতো শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়
সম্পর্ক স্থাপনে শরীর বিনিময়।
তুমি ছিলে প্রেমে– সম্পর্কে
অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের অপর পৃষ্ঠায়।
স্পর্শগুলো কি সুন্দরভাবে সামলেছো
দাগহীন শরীর-মনের ভিতর ভয় পুড়ে ছাই।
তুমি প্রথম পেরেছো আমার হৃদয় বাসনার
তরঙ্গিণী হয়ে উঁচা উঁচা পাবত অতিক্রম করতে।
পিরিত বলে কথা সবাই পারে না
তুমি সামলাতে পেরেছো পমেটম মেখে
ছড়িয়েছো পমেটমের সৌগন্ধিক নাম।
ব্যবহৃত সূর্যের হাতে পৃথিবী যেমন হয়
এবার তারই পত্তনি হবে তোমার স্থৈর্য-ধৈর্যের সীমায়।
নওতাপ কি ভীষণ অচেনা কষ্টদায়ক হয় সবার
অভ্যাস পেলে ভালোবাসা আগুনমুখো হয়।
তাই তো এবার আনুষ্ঠানিকতায় ঘুরবে পৃথিবী
খুলে দিবে রোহিণী নক্ষত্রের দ্বার।
অগ্নিপরীক্ষার পীড়নটুকু সূর্যরশ্মির সবটুকু ক্ষয়
জীবন কি সেইভাবে নক্ষত্রের তেজদীপ্ততা পায়!

গোলাম কিবরিয়া পিনুর কবিতা

নদী ও প্রেম দশদাঁতে দংশিত

আজকাল প্রেম!
বেশিমাত্রায় মার্কেটে যায়!
দর্জির দোকানে গিয়ে পোশাক বানায়!

প্রেমিক-প্রেমিকার হাতে হাতে
স্মার্টফোনের ক্যালকুলেটর!
শুধু দ্রুত হিসেব সারে না!
গুগল ম্যাপে দেখে নেয় কোন সড়কে পা রাখবে!
সম্মুখের চুল লম্বা নাকি
পেছনের চুল খাটো করে ছাঁটতে হবে?
সে-হিসেবেও পাকা!

কে হারবে? কে জিতবে?
এমন একটা প্রতিযোগিতায়–
প্রেমকেও বরফকলের নিকটে নিয়ে যায়–
অথচ বরফকলের বরফ অদৃশ্য থেকে যায়!
দেখা যায় শুধু তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র!
যা থেকে শুধুই তাপ স্খলন হয়!

প্রেমের নিবেদনে স্বর্ণ গললেই–
অলংকার হয় না! অহংকার কখনো কখনো–
জটিল গ্রন্থিতে নিয়ে গিয়ে নোনাজলে ডুবিয়ে ফেলে!
সমাবর্তন বা নবান্নে মিলিত হওয়ার ধৈর্য্য থাকছে না!
দশমূল উদ্ভিদ হওয়া তো দূরের কথা
দুইমূল উদ্ভিদও হতে পারছে না!

আজকাল নদীও ছুটতে ছুটতে বিভ্রান্ত হচ্ছে!
কোথায় যে বাঁধ তৈরি হবে দ্রুত,
তা আগে থেকে জানে না!
কখন যে জলহারা হয়ে গোঙাবে?

নদী ও প্রেম দুটোই–আজকাল,
দখলদারীদের কাছে বেশিমাত্রায় পরাজিত হচ্ছে!
–দশদাঁতে দংশিত হচ্ছে!

জামিল রায়হানের কবিতা

ফেরা

অভিমান মুছে নিও প্রেম রুমালে,
কিছু ভুল ভুলে যেও
হৃদয় খুলে,কিছু দোষ দোষ নয়,এলোমেলো দিন, তেতো ক্ষণ মুছে গিয়ে হোক না রঙিন!

কিছু কথা বাসী হোক, ছেঁড়া সকালে
কিছু রাগ মাটি হোক ভাটির কালে, কিছু ঋণ লেখা থাক লাল কালিতে,নিজের নামটি শুধু লিখে যাই, ভেজা বালিতে।

কিছু স্মৃতি পাখি হয়ে উড়ুক মনে
কিছু কথা ঘুড়ি হয়ে বাতাস টানে
কিছু ফুলে ঝরে যাক বেদনার জল
কিছু কুঁড়ি জেগে থাক চোখ ছলছল
খুব প্রিয় তারা হয়ে
আপন মনে
তুমি শুধু জেগে থাকো খুব গোপনে।

অভিমান ভুলে যেও নিবিড় ক্ষণে
ভুল করে ফিরে এসো শ্রাবণ দিনে
বুকে তোলা আছে সেই চুম্বনের দাগ
কখনো পাবে না কেউ এর কোনো ভাগ।
অভিমান জল হয়ে শেফালির ফুলে
প্রণয় শিশির হয়ে যেন শুধু দোলে।

তানভীর দুলালের কবিতা

প্রিয় মতিহার

আমায় যদি হৃদয় থেকে ডাকো
হাতের উপর হাতটি তোমার রাখো
মনের আকাশ ভরবে তারায় কত
ভুলবো যতো আগুনপোড়া ক্ষত।

পদ্মাপাড়ের ছলাৎ ছলাৎ গান
মতিহারের শান্ত-সবুজ টান
কোথায় যেন উষ্ণ ব্যথার সুখ
ফোঁড়ার দেহে আদর করার মতো।

কেমন করে ভুলবো বলো
শহীদুল্লাহ'র আমবাগানের ছায়া
স্মৃতির ঘরে প্রীতিমাখা
হাজার মুখের মায়া!

প্যারিস রোডের উদার করা বুক
পশ্চিমের ঐ এলামেলো সুখ
টুকিটাকির একটুখানি টোকা
স্বপ্নে এসে সিলসিলা দেয় ধোকা!

উদাস দুপুর গ্রন্থাগারে ঢুকে
শ্রান্তিভোলা জ্ঞানের নূপুর টুকে
মিষ্টি হাসির তাহার সাথে দেখা
ভীড়ের মাঝে অনেকখানি একা!

শহীদমিনার পুষ্পঘেরা ভূমি
রাকসুতে কি দাঁড়িয়ে আছ তুমি!
আজও তোমায় খুঁজে ফিরি
স্বপ্নে কতবার–
হে প্রেয়সী, প্রিয় আমার–স্বপ্ন-মতিহার!

তারিক-উল-ইসলামের কবিতা

হাওয়ায় হাওয়ায়– শান্তি শান্তি
(মোশতাক দাউদী সুহৃদবরেষু)

মেঘ ভাসে ইচ্ছেমতো– এদিক-সেদিক তবে সে বৈরী বাতাস কেন দাও
শিশুখেলা পুতুল পুতুল
এইখানে এই বুকে রাখো হাত– মেঘ ভাসে ইচ্ছেমতো, রাখো হাত
পরিমাপহীন
খুলে আছে দ্যাখো হাট্‌ করে সমস্ত দুয়ার তৃণলতা সবুজ সবুজ
দুঃখের জলের বুদবুদ একলা টিলায় কোমলতা ছাড়া আর কিছু নেই
আর কিছু মাড়ি ও মড়ক

মেঘ ভাসে ইচ্ছেমতো– সুনীতিগো, তোমাদের মহুয়া মাতাল আশ্রম
মনে হয় গ্যালন গ্যালন সুখ পরিমাপ; বড়ো বেখাপ্পা লাগে আমার
সকল দুয়ারে গিয়ে জেনেছি বড়ো বেখাপ্পা লাগে সবার
বড়ো কষ্ট হয়
বড়ো কষ্ট হয়, বরং এইতো আছি ভালো এই তো নিজের ভেতর

মেঘ ভাসে ইচ্ছেমতো– এদিক-সেদিক, তবে যে বৈরী বাতাস কেন দাও
শিশুখেলা পুতুল পুতুল
এইখানে এই বুকে রাখো হাত, দ্যাখো– গোলাপ গোলাপ
দ্যাখো, দ্যাখো, পুষ্ট বয়স সুগন্ধি হাওয়ায় হাওয়ায়– শান্তি শান্তি ...

[*সুবর্ণসৃজন* (২০০৫) থেকে সংকলিত]

তুহিন আব্বাসীর কবিতা

মৌনব্রত

স্বপ্নগুলো সত্যি হলে,
আকাশ থেকে ছিটকে পড়বে জ্যোৎস্নারাজী
তারাগুলো একসাথে একহয়ে গাইবে কোরাস
ক্লান্তিহীন দৌরাত্ম্যটুকু শান্ত হয়ে
বিশ্রাম নেবে স্নিগ্ধপথে

স্বপ্নগুলো সত্যি হলে,
দেখতে পাবে সামুদ্রিক স্বচ্ছধারা
কিভাবে আছড়ে পড়ে বুকের গহীন
কিভাবে বিস্তৃতমাঠে খেলায় মাতে হলুদ ফুল

স্বপ্নগুলো সত্যি হলে,
এবার দৃশ্যমান হবে নেপথ্য নাটক
ঈর্ষার অন্তরালে মুছে যাবে সমস্ত কান্না
ঝড়গুলো সুবাসিত মিষ্টি হাওয়ায়
দোলা দিবে দখিনা স্রোতে

স্বপ্নগুলো সত্যি হলে,
তোমার কাছে যাবো, যে তুমি কখনো যাওনি ভুলে পরম পাওয়ায়
তৃষিত প্রেম, এবার তোমার বুকে মাথা রেখে
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যাবো, পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে।

ফজলুল হক তুহিনের কবিতা

আলো

ঝিনুকের মাঝে মুক্তা লুকিয়ে থাকার মতো
আমার সত্তায় আলোর একটি বীজ সুপ্ত হয়ে ছিলো বহুকাল

হঠাৎ সেদিন প্রথম সূর্যের মুখোমুখি হতে
বজ্রপাত হয়ে যেন ঝলকানি দিয়ে গেলো সপ্ত-আকাশ পর্যন্ত
কি আশ্চর্য আমার হৃদয়ে দিগন্ত বিস্তারি সূর্যোদয়
কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে জ্বলে উঠলো সহসা
দুর্বাঘাসের সবুজেগাছের পাতায় ফসলের মাঠে জনপদে
সেই আলো মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুতরেখার মতো
পিরামিড যুগ থেকে বহমান সময়ের সমস্ত আঁধার
আমি নিমেষেই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম কালের ডাস্টবিনে।

অতঃপর সূর্যাস্তের শেষ আলোনদী ও আকাশের সন্ধিস্থলে
ডুবে গেলে দ্বাদশী চাঁদের আলোয় আমার প্রাণ
জোছনার জোয়ারে প্লাবিত স্নাত হয়ে গেলো মহানন্দে
কালো মেঘের ডানায় জোছনার গ্রাস হলে
হৃদয়ে আমার নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্তি ছড়ালো হাসিতে
আমি সত্যি বুকে পুরে নিয়েছি সাতটি তারার জ্যোতি থেকে
নিহারীকাপুঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র আকাশ!

বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা আগ্রাসী মেঘের দৈত্য
আমার আকাশ ছেয়ে ফেলে মুহূর্তেই আমি
ডানা ঝাপটিয়ে আলোর তৃষ্ণায় সাঁতার দিলাম প্রাণপণ।

দেখলাম জীবনের প্রেমে গুঞ্জরিত জোনাকীর ঝাঁক
আমার হৃদয়ে দীপ জ্বেলেছে অবাক!

বেলায়েত হোসেন বাবলুর কবিতা

ত্যাগ স্মরণ

তোমার উদ্ধত তর্জনী
উদ্দাম জটাজালে মিলিত ঐক্য
দিয়েছো স্বাধীনতা

নির্মম গণহত্যা
তোমাদের বিগলিত রক্তে ঢেলেছো নিঃস্বার্থ ত্যাগ
দিয়েছো স্বাধীনতা

সুরক্ষিত সম্ভ্রমহানি
তোমাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে পশুত্বে
দিয়ছো স্বাধীনতা

অগ্নিত্রাসন
শত্রুর অগ্নিশিখায় জ্বলেনি বাংলা
জ্বেলেছে ঘরে ঘরে মুক্তির গৃহদ্বীপ
জ্বলেছে স্বাধীনতার শিখা-চিরন্তন

ধ্বংসলীলা
শত্রুর ধ্বংসানো বিধ্বস্ততায়
নির্মিত হয়েছে বাঙলার স্বাধীনতা

হায় স্বাধীনতা!
তবে কেন করবীর বিষপাতায় ঢেকে আছে
আজো আমার স্বদেশ
সবুজ লালের রঞ্জিত আলোয় মুক্ত হোক
আমার পতাকার সোনালী জমিন ॥

মাহমুদ হাসানের কবিতা

তার জন্য পদ্য

চব্বিশে খুব মনে পড়ে একাত্তর
তার শরীরভরা শ্রাবণ
তার কান্নাভেজা চোখ;
খুব মনে পড়ে অজানা গন্তব্য
রোদ-বৃষ্টি কাদামাটিঘাস
লতাপাতা; চারিদিকে আঁধার।

চব্বিশে খুব মনে পড়ে একাত্তর
তার নূপুর পা
তার ধুলোমাখা চুমু
ভোরবেলা ঝাউবনে পাখি ডাকে
সন্ধ্যায় গান বাঁধে কবিয়াল;
ভগ্নপ্রায় দালানের চিলেকোঠায়
সেই কিশোরকে খোঁজে নিঃসঙ্গ স্টেনগান।

চব্বিশে খুব মনে পড়ে একাত্তর
তার সোনালি স্বপ্ন
তার রুপালি ভালবাসা
তার জন্য এক নদী অপেক্ষা;
সে আমার মায়াবী উঠোন;
বৃষ্টিধোয়া গোধূলির কাজলরেখা।

বনশ্রী ২৭.১২.২০২৪

মোহাম্মদ মাহবুব আলমের কবিতা

কবি ও রাজনীতিবিদ

ইতিহাস দখল করে চলছে
রাজনীতির বাণিজ্য
প্রেমের কবিতায়ও ইতিহাস বিশ্লেষণ থেমে নেই
কোন সাইনবোর্ড টাঙালে নেতা হওয়া যায়, আর
কবিতায় কতটা প্রেম মেশালে
তোমার হওয়া যায়
সেটা রাজনীতিবিদের মতো কবিও জানে।

কী ভয়ানক চাতুর্য!
দেশপ্রেম আর প্রেমের ফাঁদে
তুমিও দেশ।
মুক্তি মিলবে না তোমাদের
মাদকতা মিশেল বুলিতে
আমজনতা আর তুমি প্রেমময়!

মন চুরি আর দেশের স্বপ্ন চুরি
যদি সমান অপরাধ,
তবে কবির সাথে নেতাদের
কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে কে?
আমি রাজি, কবিদের হয়ে
বিচারের মুখোমুখি হতে।
অসহায়ত্ব স্বীকার করে তোমার
হৃদয় ফিরিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হতে।
তবে নেতাদের বলো
মিথ্যে দেশপ্রেমের খোলস ছেড়ে
পুঁজি করা ইতিহাস ফেলে
নতুন ইতিহাস গড়তে।

আমি কবি, মিথ্যেবাদী নই
শুধু স্বপ্ন ঢালি হৃদয়ে হৃদয়ে।

সুমন শামসের কবিতা

রাক্ষস ও যাপিত জীবনের মাংস

বন্দিত্ব আর ক্ষুধার মাঝখানে পাখি দুটি ছিল যুদ্ধরত। মাতৃভূমি ত্যাগের মতো খাঁচা ছেড়ে যেতে চাইল না ওরা। গরাদের ভেতরেও থাকে হয়তো বন্দিত্বের মায়া। নয়তো জীবনের কারাগারে কেনইবা মানুষ কাটিয়ে যায় যাবজ্জীবন! পৃথিবীর সমস্তপ্রাণ সংগ্রাম ভালোবাসে, ক্ষুধা ভালোবাসে, ভালোবাসে প্রেম কাম মুক্তি ও স্বাধীনতা। অগাধ এ বৈপরীত্যেই কেটে যায় মোহময় জীবন। হয়তো তাই বন্দিত্বের মাঝেই পাখিদুটি খুঁজে নিল ডানাহীন স্বাধীনতা। এখানে শুধু ক্ষুধার জন্য লড়াই। দুমুঠো খাবারের জন্য টিসিবির আর্তনাদ কণ্ঠে তুলে নিতে হয় এখানে। তখন পুঁজির বিবর্তনের মতো আমাদের মন হয়ে যায় মাংসাশী। আর মুখ, সাম্রাজ্যবাদী কোনো রাক্ষসের প্রতিকৃতি। ক্ষুধার্ত পাখিদুটি মরে যায়। মরে যায় হাভাতের মতো টিসিবির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধার্ত সব মা ও তার সন্তান।

বস্তুত এভাবেই প্রতিদিন রাক্ষসদের জন্য ক্ষুধার্তদের আমিষ যোগাতে হয় যাপিত জীবনের মাংসে।

সুমাইয়া খানমের কবিতা

২০২৫

ভ্যানিটি ব্যাগে কয়েকটি জোনাকপোকা নিয়ে চলা আর। প্রয়োজন নেই তরমুজের মতো ফালি করে কাটা চাঁদের। অবারিত রাশি রাশি জ্যোছনা চাই এখন আমার। ভাবনার যতই গভীরে যাই সত্যগুলো ততই ঝাঁকধরা মাছের মত বুদ্বুদ তুলে ওপরে উঠে আসে, ভাবনাগুলো ফেনিয়ে ওঠে। ফেনায়িত ভাবনা হয়ে যায় চিতার আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতা। দাহ হচ্ছে আমার লেখার অক্ষরগুলো। কী এক অজানা কষ্টে ঝরছে অশ্রুবিন্দু! নীল অভিশাপের কাফনে মোড়া আমার অশ্রুবিন্দুর এই কি তবে শেষ যাত্রা? অথচ দেখেছি, শ্রাবণসন্ধ্যায় এই অশ্রুর রক্তাক্ত ক্ষরণ, বিবর্ণ-বিষণ্ন উদাস খরদুপুরকে ভিজিয়ে তুলেছে এই অশ্রুবিন্দুই। আরো দেখেছি খুব গোপনে– নিশুতি রাতে মহাবিশ্বের সবকিছু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে জামরঙের অন্ধকারে ফোটায় ফোটায় গুমোট; নিঃশাব্দিক সে অশ্রুর ঝরে যাওয়া। সে দিনগুলোতে একবারও মনে হয়নি হারাচ্ছি নিজ সত্তা। তবে এখন কেন এ বোধ– নেই হয়ে যাচ্ছে আমার 'নিজের আমি'!

কী নিষ্প্রাণ সকাল, যেন সন্ধ্যের সাথে ওর আলিঙ্গন। ধোঁয়াটে অন্ধকারে বসে আছিমনের কোণে ছোট্ট আশা নিয়ে। কুয়াশা সরিয়ে আজ নতুন এক সূর্যকে দেখব নতুন করে। এ আলো নতুনের বারতা আনবে। আলোটাকে আজ ভীষণ প্রয়োজন। গণনার শুরু থেকে আজ ২০২৪ এর শেষ প্রান্তে এসে থেমেছি। আসছে নতুন বছর, নতুন করে কিছু পাবার আশায় বুক-বাঁধার দিন আজ।

মন ফিরে পায় চেতনা। খোলা চোখ মনের বন্ধ চোখকে ডেকে তোলে। দেখি কুয়াশার জাল ছিঁড়ে সেই প্রতীক্ষিত সূর্য, অনেক কাঙ্ক্ষিত আশার আলো আমায় ডাকছে। বলছে– 'হারাবার ভয় বৃথা আজ। এখন থেকে শুধু প্রাপ্তির সূচনা হোক।' আমার অন্ধকার আলোয় ধুয়ে যায়। নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রেরণা, নব-আকাঙ্ক্ষা নতুন করে আমার মনে ঘর বেঁধে যায়। আমি আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হই। জেনে নেই প্রয়োজন শুধু নির্ভেজাল প্রতীতি...

সদ্য সমুজ্জ্বলের কবিতা

রুপালি, চাইলেই পাব না জানি

চাই নিদ্রার নিশ্চয়তা, অধিক আদরজনিত ঘুম
প্রিয়স্পর্শ অনুষ্ঠানের উপভোগ
আরও চাই সুখের বিস্তারিত অনুরণন
কোমল-কাতর দৃষ্টি বিনিময়
চাইলেই পাব না জানি, তবু চাই, চাওয়াতে পাপ কী

পাশাপাশি ছায়াদৌড়, ছায়াহীন বসন্তবরণ
সাফল্যের অসুখ, ব্যর্থতার সুখ, যৌবনের শিশু
না-বোঝা অভিযান, আনমনা খুনশুটি
অভিমানে বাড়ন্তক্ষণ, নিজস্ব আয়োজন
এসবও চাই, চাইলেই পাব না জানি, তবু চাই

বহুবার চেয়েছি আঙুলের সাধনা, যৌবনের কল্যাণ
দৈহিক শিল্প, গ্রহণযোগ্য ঢেউ, মোহের নতুন সংস্করণ
আত্মমগ্ন গতি, তবু বারবার সব গল্পে তোমার রক্ত-মাংস
আশার জমিনে নিত্য ক্ষয়, পিছুটান, অভিমান
এপরও চাই রুপালি, চাইলেই পাব না জানি

সৈয়দ তৌফিক জুহরী

পিঁপড়াবিদ্যা

খোলা জানালায় বসলেই মুখে আলো এসে পড়ে। আলোটা বেশ ঝলমলে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তাই কিছুক্ষণ পরে আর বসা যায় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। এই আলোর উৎস সামনের দশতলা বিল্ডিংটা। ওই বিল্ডিংয়ের সাত তলার জানালার কাচে আলোটা ঠিকরে এসে পড়ে মাধবীদের জানালায়। ওই সাততলার ওরা যদি নিজেদের জানালাটা বন্ধ করে রাখে, তবেই শুধু মাধবীদের জানালায় এসে আলো পড়ে।

তাই জানালায় বসার আগে দশতলা বিল্ডিংয়ের সাত তলার সেই জানালার দিকে তাকিয়ে আগে দেখে নেয় মাধবী। দেখে, জানালাটা বন্ধ কি-না। ওদের জানালা বন্ধ থাকলে এখানে বসে লাভ নেই। আলোর ঝলকে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

আগে যখন এই দশতলা বিল্ডিংটা ছিল না, তখন মাধবীর খুব প্রিয় ছিল জানালাটা। দেখতে, দেখতে চোখের সামনে গড়ে উঠল দশতলা বিল্ডংটা। তাতে তাঁর প্রিয় জানালাটার পাশে বসার মজাটাও গেল উবে। এখন দৃষ্টি রাখতে হয় ওদের জানালায়। দেখতে হয়, ওদের জানালাটা খোলা কি-না। ওই বিল্ডিংয়ের কারণে আকাশটাও দখল হয়ে গেছে। রাতে চাঁদ দেখা যায় না। দিনে মেঘ দেখা যায় না। একটা ঘোলাটে ছায়া সবসময় পড়ে থাকে চারিদিকে। আগে যেখানে গাছের ছায়া পড়তো, আজ সেখানে পড়ে কংক্রিটের ছায়া। মৃত ছায়া। প্রাণহীন। গাছপালার ছায়াতো হাওয়ার সাথে দুলতে পারে। খেলতে পারে। কংক্রিটের দেয়ালতো তা পারে না। সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। স্থির হয়ে।

মাধবীর মনে প্রশ্ন খেলা করতে থাকে। তার জানতে ইচ্ছে সাততলার ঘরে কে থাকে? সেখানে কী ঘরভর্তি দামি আসবাব রয়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে ঝাড়লণ্ঠন, সুবিশাল গালিচা এইসব। ক্লান্তি এলেই কী বাড়ির লোকজন ড্রয়িংরুমের সোফায় গা এলিয়ে বসে। আর বসলেই গা ডুবে যায় নরম সোফার গভীরে। ফুলদানিতে সাজানো রয়েছে বিদেশী ফুল। মোহনীয় ড্রয়িংরুম সাজানো রয়েছে দামী শোপিস, পাথরের মূর্তি; আর দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য রয়েছে বড় স্ক্রিনের টেলিভিশন, এয়ারকুলার, আলোকসজ্জা, মসৃণ টাইলস-ফিটিংস আরও অনেক কিছু। ঘুষ খেয়ে-খেয়ে শরীরে চর্বি না জমলে কী এতো ওপরের তলায় থাকা যায়? এইসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন তপনকে জিজ্ঞেস করেই বসে,'ওই সাততলায় কারা থাকে? তুমি কী জানো?'

এ কেমন উপদ্রব; প্রশ্নে তপন ঘামতে থাকে। বিকেলবেলা, জুতোর মুখে চটচটে চকলেটের মতো জুতোর কালি মাখতে-মাখতে, বাদামি ব্রাশ দিয়ে ঘষতে-ঘষতে, এমন একটি বিচিত্র প্রশ্নে কান পাততে হয় তপনকে। তবুও থতমত খেয়ে বলেন, 'সাততলা!'

অনেকক্ষণ মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে – তাঁর মিষ্টি দুটি চোখে, কণ্ঠের ললিতকলায়, মুখের রাজধানী ঘিরে ভেসে ওঠা বিস্ময়ের মুগ্ধতায়, জুতোর কালি ও ছায়ার চিত্রকলা সবকিছু গুলিয়ে যায়। উত্তর খুঁজে পায়না তপন। অচেনা মানুষের খবর কী চাইলেই নেওয়া যায়? এইসব উদ্ভট চিন্তা কখনো মনে উদয় হয়নি, কিংবা ডুবুরি দিয়ে খুঁজেও নিজের মনের গভীর তলদেশেও তো এমন ভাবনার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

আসলে মনের ভেতরে নানারকমের কাজ ঢেউ তুলছে। তাই তার মুখ নির্বিকার স্থির রঙহীন আর ফ্যাকাশে হয়ে থাকে সবসময়। চারপাশের ঝরে পড়া আলো দেখতে পায় না। মুখ কিংবা মুখোশ,

বুঝতে পারে না। কোনও একটা কাজে ডুবে গেলে, ভুলে যায় চারপাশের জগৎ। দু-একটা আওয়াজ কানে এসে যে ধাক্কা খায় না, তা ঠিক নয়। কিন্তু রাতভর তার ঘুম হয় না। সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পরও সে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ছাদের সিলিংয়ের দিকে। মাধবী অবশ্য ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণে। তপনের ঘুম হবে কী করে? ঘুমানোরই তো সুযোগ নেই। সারা দিনের হিসেব মেলাতে থাকে মগজ-মস্তিষ্ক। বিড়বিড় করে। কখনও-কখনও জোর করে হিসেবটা মাথা থেকে সরিয়ে দেয় সে। তখনও হিসেবটা পুরোপুরি যায় না। মাথার ভেতরে থেকে যায়। বিজ-বিজ করে, খট-খট করে পুরোনো দিনে টাইপরাইটারের মতো। কখনও-কখনও ইনভেস্ট করে নতুন ব্যবসায়, তবে কল্পনার জগতে। সেখান থেকে কল্পনাতেই লাভ-লোকসানের হিসেব মেলায়। কল্পনার মুঠোফোনে কল আসে। রিসিভার রিসিভ করতে গিয়ে মাথার শিরা দপদপ করে। যদিও পুরো ঘটনা ঘটে কল্পনাতেই, কিন্তু মাথার শিরাটা দপদপ করে সত্যি-সত্যি। মাথাটা ব্যথা করে সত্যি-সত্যি। কল্পনা, ব্যবসা, হিসেব, মাথা ব্যথা, ঘুমহীনতা প্রভৃতি নানা রকমের যন্ত্রণা কম্পন তোলে। তখন সবকিছু মিলিয়ে অতীত খুব সুন্দর মনে হয়, শৈশব। মনে হয় যেন সেই সময়টা একটা ফুলের বাগান, চারিদিকে অসংখ্য ফুল। বাতাসে দোল খাচ্ছে। চোখ তুললেই সে দেখবে একটা লাল গোলাপ ফুটে রয়েছে। ওইদিকে রজনীগন্ধা। রাত্তিরে ছড়াবে সে সৌরভ। আরও যেন আছে দোপাটি, বাগান বিলাস, হাসনাহেনা এইসব।

মাধবী কিন্তু নিজের প্রশ্ন ভুলে যায়নি। সে তার ছায়া-রহস্যের জট ভেঙে বলে,'আমি বলতে পারব?'

'কি পারবে?' তপন প্রশ্ন করে।

'ওইযে–সাততলায় কারা থাকে? আমি বলতে পারব।'

'ও!' স্যারাদিন আরও অনেক উদ্ভট প্রশ্ন করে মাধবী। কেন যে করে? 'ঠিক আছে','হ্যাঁ', 'আচ্ছা'–এই ধরনের নির্ধারিত কিছু উত্তর দিয়ে সেইসব প্রশ্ন থেকে বেঁচে ফেরে তপন। মাঝে-মধ্যে উত্তর না দিয়ে বেঁচে ফেরার উপায় থাকেনা। আজ বোধহয় সেইরকম একটি দিন। এইদিকে নিজের হিসেব-নিকেশ আর কল্পনার জগৎ থেকে বের হয়ে এসে, তপনের ভাল লাগে না। সে মাধবীর মুখের দিকে তাকায়। চোখের দিকে। তারপর প্রশ্ন করে,'কীভাবে বলতে পারবে? বলো। আমি শুনছি।'

'যাহ্! তুমি কী বোকা। সেটা কী সম্ভব নাকি। তুমি আমার দিকে মন দিচ্ছো না, তাই বললাম এমন কথা।'

'ও!' তপন একদম বোকা বনে যায়। কিন্তু কিছু বলে না। চুপচাপ মাধবীর চলে যাওয়া দেখে। ছেলেমানুষী দেখে। এইভাবেই দিন কাটছে। ভালো একটা চাকুরি পেলে খুব ভালো হতো। সেই সুযোগ কোথায়? কোচিং সেন্টারে মাস্টারি করে দিন কাটছে। উপার্জন মন্দ না, কিন্তু চাকুরিটা স্থির নয়। উপার্জনও স্থির নয়।

তপন এবং মাধবী দুজনে মিলে নিজেদের এই ভাড়া বাড়িটা খুঁজে পেয়েছে গলির পর গলি খুঁজে-খুঁজে। এমনও এলাকায় যেতে হয়েছে যেখানে একদিকে নর্দমা, অন্যদিকে তৈরি হতে থাকা উঁচু দালানকোঠার জন্য জমা করে রাখা হয়েছে ইট-বালু-সিমেন্ট-পাথর। মাঝেমধ্যে রিক্সা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পচা গলির মুখে ঢুকতে গেলে রিক্সা থেকে নামতে হয়েছে। একবার রিক্সা থেকে নামার সঙ্গেই নামল বৃষ্টি। তপন আঁকড়ে ধরে ছিল বলেই পা পিছলে যায়নি। তবে ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছিল চতুর্দিকে, এতে মাধবীর শাড়িটা ভিজে জবজবে। শাড়ির ঝুল বারবার চলে যাচ্ছে পায়ের তলায়। মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আরও যে কত রকমের ঘটনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কখনও সন্ধ্যা নেমেছে ঝুপ করে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই। ল্যাম্পপোস্টগুলো জ্বলে ওঠারও সময় পায়নি। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন বুঝে গিয়েছিল এই এলাকায় থাকা যাবে না। বাড়ি ভাড়া নেয়া যাবে না।

কোনও-কোনও বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে তপন চলে গিয়েছিল ভেতরে। ভাড়া বাড়িটা ঘুরে দেখতে। এদিকে মাধবী দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেলেও দেখে, তপন আর

ফিরছে না। কত রকমের বিদ্ঘুটে পরিস্থিতি যে সামাল দিতে হয়েছে, তা আর বলার উপায় নেই। তপন বাড়ির ভেতর থেকে ঘুরে এসে মাধবীকে হাতঘড়ি দেখিয়েছে। দেখিয়েছে, ঘড়ির কাঁটা পাঁচ মিনিটওতো পেরিয়ে যায়নি। অথচ মাধবীর মনে হয়েছে ঘন্টা পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। নানা রকমের ঘরবাড়ির শূন্যতার সামনে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে মাথার ভিতরে ঝিম ধরে গিয়েছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তপন বেশ কয়েকবার কোল্ড ড্রিংক্স কিনে খাইয়েছিল। দোকানদার ফ্রিজের ঠাণ্ডাঘরের ভেতর থেকে বের করে দিয়েছিল রঙিন তরল ভরা বোতলটা। তার ঠাণ্ডা ওম সে ছুঁয়েছিল গালে। দুপুরে খাওয়া হয়নি, তবুও ভালো লেগেছিল। একটা চুম্বকের মতো আটকে আছে জীবনটা। আর এই বাড়িটা খুঁজে পাওয়ার পর দুঃখটা আর রইল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল দুজন। তরপর কত স্বপ্ন! এখন এই দশতলা দালানটা কেড়ে নিয়েছে সমস্ত স্বপ্ন।

বাসা খোঁজার দৌড়ঝাঁপের ভেতর একবার মনে হয়েছিল বাবার বাসায় চলে গেলে ভাল হয়। যদিও এই কথা মনে হয়েছিল সাবলেট থাকার যন্ত্রণায়। কুৎসিত রান্নাঘর, বাথরুম, টয়লেট, বেসিন ইত্যাদি একত্রে ব্যবহারের সাবলেটিয় বেদনায়, হাহাকারে। বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, খবরের কাগজের বিল ইত্যাদি বহু প্রকারের বিল একসাথে মেটাবার ঝামেলায় বিদ্যুৎ-পানি প্রায়ই থাকত না। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে রান্নাঘরে যেতে হত। কুৎসিত টয়লেট থেকে আসত আবর্জনার দুর্গন্ধ। রান্নাঘরে ময়লা উপচে থাকত। পা ফেলার জায়গা নেই। মাত্র দুই গ্যাসের চুলায় তিনটা পরিবারের জবরদখল। ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেরার সময় এক-একটা ঘরের বন্ধ দরজা থেকে বেরিয়ে আসতে একেক রকমের শব্দ। কোথাও গালি-গালাজ, কোথাও ফিসফাস-গীবত, কোথাও প্রেমের শীৎকার।

সেহেতু বাবার বাড়িতে যাওয়ার কথা মাথায় আসার পরক্ষণেই নিজের চেতনার ওপরই একটা বিরক্তির সর জমে উঠল। দপদপিয়ে উঠল মাথার রগ। বিয়ের পর যে বাড়িতে সে উঠেছিল, তা যেমনই হোক নিজের একার সংসার। আর বাবা-মায়ের সংসারে ফিরে যাওয়া মানে একটা জঙ্গলে ফিরে যাওয়া। বাঘ-সিংহ-জলহস্তি-শিয়াল এইসব প্রাণীতে ভরা একটা যৌথখামারে ফেরা, যা একপ্রকার চিড়িয়াখানায়। প্রতিদিন মাধবীর মায়ের দশ-বারো জনের রান্না করতে হয়। ভরা বাড়ি। রক্ত-সম্পর্কের লোকজন দিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে খুটখাট লেগেই থাকে। মাধবীর বাপ কাউকে ফেলতে পারেননি। প্রায় সকলকেই ঠাঁই দিয়েছেন। এতে তাদের বাড়িটাও এক প্রকারের সাবলেট-জীবন দিয়ে ভরা। নিজের বলে কিছু নেই। কেউ না কেউ বেশী রাত অব্দি আলো জ্বালবেই। কেউ না কেউ পানির কল ছেড়ে রাখবেই। কেউ না কেউ মুখের ওপর কুৎসিত কথা বলে বাঁকা হাসি হাঁসবেই। তারপরও সকলে মিলেমিশে থাকার যে আনন্দ, তা তো আছে। উৎসবে বাড়িটা গমগম করে উঠত। সেই আনন্দ ফেলনা নয়, কিন্তু সেতো একটাই পরিবার।

তাইতো বুঝেসুযে চলাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার। কাকী এসে ঘরের আলো জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করলেও মা কিছু বলতে পারতেন না। দুটি চোখের পাতা এক করতে পারতেন না। মাধবীকেও অনেক রাত জেগে কাটাতে হয়েছে। প্রাইভেসি বলে কিছু নেই। রাতের বেলা মুখের সামনে একটা বই মেলে ধরে আলো ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে হয়েছে। বইটা দিয়েই মুখটা ঢেকে নিত। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে-করতে দিন পেরিয়ে গেছে। বিয়ের পর নিজের সংসারে প্রথম-প্রথম সাবলেট-জীবন কষ্ট দেয়নি, কিন্তু খানিকটা শান্তিতো সে চেয়েছিল। সেটা তপনকে বলতেই সাত মাসের সাবলেট-জীবন ভেঙে নতুন ভাড়া বাড়ি খুঁজতে বের হয়েছিল তারা। একটা ছোট ঘর, এক রুমের, তা হলেও তো ঘরের ভেতরের ছড়ানো-ছিটানো সবকিছু নিজের। দুবেলা না খেয়ে

থাকলেও কারও ঘাঁটাঘাঁটির সুযোগ নেই। কারও নাক গলানোর সুযোগ নেই। কারও অঘঠন ঘটানো সুযোগ নেই। কাহিনী কচলানোর সুযোগ নেই।

আজ ওই সাততলার জানালাটা খোলা দেখেই নিজের ঘরের জানালায় বসেছিল মাধবী। চোখে আলো লাগার সুযোগ নেই। চোখ ঝলসানো সুযোগ। চারিদিকে মিষ্টি একটা হাওয়া খেলা করছে, মৃদুমন্দ। এর মধ্যে, দুচোখে ঘুম চলে এল মাধবীর। ঘুমিয়ে কী সে সত্যিই পড়েছে? সত্য নাকি! নাকি কল্পনা। সে দেখে, সেই সাততলায় সে সত্যিই পৌঁছে গেছে। বাড়িটা ঠিক তার কল্পনার মতই। সারা বাড়ি ঘুরতে-ঘুরতে সে চলে আসে প্রধান ফটকে। এবার তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, কিন্তু সে নামতে পারে না। সে সাততলায় পৌঁছে গেছে ঠিকই, তবে মানুষ হিসেবে নয়। একটা পিঁপড়া হিসেবে। সে পরিণত হয়েছে একটি ছোটো কালো পিঁপড়ায়। দীর্ঘ-দীর্ঘ সিঁড়ির মাথায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একা। মুখে একটি মাত্র চিনির টুকরো। আর কিছু নেই, কেউ নেই!

e-mail: staufiq999@gmail.com

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন

আবুল হাসনাত : লেখক তৈরির কারিগর

'আবুল হাসনাত ভাই নেই। অবিশ্বাস্য মনে হয়। এইতো দেখা হলো বাংলা একাডেমির এক সাধারণ সভায়। আমাদের সাহিত্যচর্চার পথে একজন অভিভাবক বিদায় নিলেন। দেখা হলেই বলতেন, লেখা দিয়েন। তিনি ছিলেন লেখক তৈরির কারিগর। *সংবাদ সাময়িকী*-তে তিনি আমার প্রচুর প্রবন্ধ ছেপেছেন। রাজশাহী থেকে ঢাকায় গেলেই, লেখক সম্মানী দ্রুত পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতেন। *কালি ও কলম* এর দক্ষ সম্পাদক, লেখক তালিকায় আমাকে স্থান দিয়েছিলেন। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। মহান আল্লাহ তাঁকে শান্তি দান করুন।' ১ নভেম্বর ২০২০ এটি ফেইসবুকে পোস্ট দিই, হাসনাত ভাইকে নিয়ে তোলা একটি গ্রুপ ছবিসহ। সাহিত্যামোদী বহু বন্ধু যশস্বী কবি-সম্পাদক-চিত্র-সমালোচকের প্রয়াণ সংবাদ জেনে শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দৈনিক বাংলাদেশের খবরের সাহিত্যপাতা- 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির খবর'– উল্লিখিত পোস্টটি বিশিষ্ট কবি-লেখকদের শোকগাথা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

রাজশাহী আমার আবাসভূমি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের গ্রাম কাজলা। সদ্যস্বাধীন দেশে ভাষাপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধবালক, যৌবনে পা দিয়ে বিজ্ঞান ছেড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়া শুরু করি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বেতার ও শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন সাহিত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও লেখালেখি হয়ে ওঠে নিত্যসাধনা। শ্রেণিকক্ষে বিশেষ কজন শিক্ষকের পাঠগ্রহণ ছাড়া পাঠাগার ও বই পত্রিকার দোকানের প্রতি আগ্রহ ছিলো বেশি। তখন সতীর্থ বন্ধু আফজাল হোসেন ছবি *দৈনিক সংবাদ* এর রাজশাহী প্রতিনিধি। তার সাথে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে *সংবাদ* পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ভালো লাগে চারণ-সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিনের প্রতিবেদন, শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগ, সংবাদ সাময়িকী- সর্বোপরি পত্রিকাটির প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও লিটল ম্যাগাজিনে টুকটাক লেখালেখি করলেও সত্তরদশকের মাঝামাঝি থেকে *দৈনিক সংবাদ*-এর শিল্প ও সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সাময়িকীর জন্যে লেখা পাঠাই। ছাপা হয়। পরে কেবল সাময়িকীর পাতায় লিখতাম। সে-লেখা চোখে দেখার জন্যে কী অধীর প্রতীক্ষা! তখন বঙ্গবন্ধু সেতু হয় নি। রাজশাহীতে পত্রিকা আসতে বিকলে গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়। ছুটে যাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস কিংবা শহরে সোনাদীঘির মোড়ে পত্রিকার সন্ধানে। মুদ্রিত লেখা হাতে পেলে মুগ্ধচিত্তে পত্রিকা নিয়ে ঘরে ফেরার পথে নতুন লেখার পরিকল্পনা আঁটতাম। এভাবে প্রায় সাতবছর কেটে যায়। আবুল হাসনাতের সাথে সাক্ষাৎ ফোনালাপ কিংবা পত্রবিনিময় হয়নি। আমি কেবল দূর থেকে সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তাঁর রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হই। চার পৃষ্ঠার সমায়িকী কী চমৎকার শিল্পসজ্জায় ভরিয়ে তুলতেন। কবিতা, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, প্রবন্ধ, বই আলোচনা, নির্ধারিত কলাম থাকতো এবং বিশেষভাবে থাকতো চিত্রকলা সম্পর্কিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-আলোচনা-সমালোচনা-প্রতিবেদন। চিত্রশিল্পের প্রতি হাসনাতের দুর্বলতা-ভালোবাসা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বরাবরই সক্রিয় ছিলো। প্রগতিপন্থী ও স্বাধীনতার পক্ষের পত্রিকা *সংবাদ* এর কাটতি ছিলো কম। তবে কেবলমাত্র বৃহস্পতিবারের সংবাদ সাময়িকীর জন্যে আমার মতো অনেকেই ঐ পত্রিকার পাঠক ছিলেন। রাজধানীর বাইরে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা লিখতে আগ্রহী বহু তরুণ-তরুণীকে তিনি লেখক বানিয়েছেন, দূরে থেকে কাছে টেনেছেন-যথার্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবুল হাসনতের আরেক কীর্তি *গণসাহিত্য* পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর সক্রিয় বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডজনিত বোধ-বিবেচনা এ পত্রিকায় প্রতিফলিত। সাহিত্যকে তিনি গণমানুষমুখীন করতে চেয়েছিলেন। লেখা সংক্রান্ত আহ্বান ছিলো-' জীবনমুখীন নবীন ও প্রবীণদের লেখা গ্রহণযোগ্য।' ৭ আগস্ট ১৯৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'গণসাহিত্য' পত্রিকার ভূমিকায় সম্পাদক বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ অপরিমেয় রক্ত দিয়ে শুধু স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করেনি, সূচনা করে গেছে গণসংস্কৃতি ও গণসাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের। একে আজ সংহত করার প্রয়োজন বড় বেশি। যেমন প্রয়োজন রয়েছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ পুণর্বিন্যাসের তেমনি মানবাত্মার উপাদান শিল্প ও সংস্কৃতি তথা সাহিত্যের গণমুখী ধারাকেই সচেতন প্রয়াসে এগিয়ে নিতে হবে সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে। মাঠের মানুষের কাছাকাছি হওয়া শুধু নয়, তার আশা আকাংখ্যার হৃদস্পন্দন ধ্বনিত হওয়া চাই সাহিত্যে। সাহিত্য তখনই হয়ে উঠে গণমুখী। এবার নবজীবনের শুরু। বন্ধ্যাত্ব দশা ঘুচিয়ে শিল্প সংস্কৃতিকে জীবনের দিকে দাঁড় করাতে হবে।... মানব মুক্তির মহৎ ব্রত নিয়ে গণসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করছে।' সারাদেশের প্রগতিশীল নবীনপ্রবীণ লেখকদের তিনি কাছে টেনেছেন-সাহিত্য পত্রিকার দিয়েছেন নতুন মাত্রা। লেখা সংগ্রহ ও লেখক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবুল হাসনাত ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। *গণসাহিত্য* এর লেখক-তালিকা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। *গণসাহিত্য* এর সেই বাহাত্তর সালের লেখকবৃন্দই আজো বাংলাদেশের সাহিত্যকে প্রতিনিধিত্ব করছেন– যদিও তিনিসহ কেউ কেউ প্রয়াত। *গণসাহিত্য*-এ প্রকাশিত তাঁর (মাহমুদ আল জামান) একটি কবিতার শেষাংশ :

> যাচ্ছি প্রতিদিন বহু দূরে, চলে যাচ্ছি
> প্রতিদিন দূর ফেরারের গানে
> যেখানে রক্তাক্ত স্বাধীনতা, জীবনের গান
> লোকালয়ে, জনপদে, সারিতে সারিতে
> আমাদেরই বীজ উঠছে থরো থরো।

ছাত্রজীবন শেষ করে রংপুর ক্যাডেট কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ পাই। তখন আশির দশক। কলেজের বিশেষ কাজে ঢাকা যেতে হলো। কাজের ফাঁকে *সংবাদ* অফিসে গেলাম। একজনকে জিজ্ঞেস করলে সাহিত্য সম্পাদকের টেবিল দেখিয়ে দিলেন। কাছে গিয়ে দেখলাম, গুরুগম্ভীর সুদর্শন এক ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে কোনো এক লেখকের পাঠানো লেখা পড়ছেন। সালাম দিয়ে নাম বললাম। বড় মায়বী দুটো চোখ তুলে বললেন, রংপুর থেকে এসেছেন, বসুন। দেখলাম তাঁর টেবিলের সামনে একটিই চেয়ার, ফাঁকা। বসলাম। তিনি সংবাদ সাময়িকীর বাঁধানো একটি ফাইল বের করে আমার নাম ও কোন্ তারিখে কোন্ লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা করে হাতে দিয়ে বললেন, হিসাব শাখায় গিয়ে আমার কথা বলুন, সম্মানীর টাকা দিয়ে দিবেন– ঠিক আছে। পুনরায় সালাম দিয়ে হিসাব শাখায় যাই।

এরপর বহুবার হাসনাত ভাইয়ের সাথে সংবাদ অফিসে ও বাংলা একাডেমির চত্বরে দেখা হয়েছে। দেখেছি তাঁর পরিমতিবোধ ও কাজের প্রতি প্রবল মনোযোগ। প্রায় বলতেন লেখা দিয়েন, বড় লেখা, ছোটলেখা মেকআপ দিতে অসুবিধা হয়। আপাতভাবে তাকে রাশভারী মনে হলেও তিনি ছিলেন উদারমনের মানুষ। সুধীজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নবীনদের প্রতি স্নেহপ্রবণ-এর প্রকাশভঙ্গিতে প্রাবল্য নেই, আছে মার্জিতবোধ। কোন এক বৃহস্পতিবারের *সংবাদ* রংপুর যায় নি। সে সংখ্যায় আমার একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। হাসনাত ভাই জানতে পেরে লেখাটি ফটোকপি করে আমাকে পাঠান। আমি মুগ্ধ হই।

সংবাদ-এর আর্থিক অবস্থা সবসময় সন্তোষজনক ছিলো না। হাসনাত ভাইকে দেখলেই চিন্তিত মনে হতো। তাঁর ব্যক্তিগত সংকট-সমস্যার কথা কাউকে বলতেন কি না, আমার জানা নেই। তবে *সংবাদ* অফিসে দেখেছি- কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক ও আব্দুল মান্নান সৈয়দের সাথে মন খুলে ধীর লয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলতেন। তাঁর উচ্চারণ শুদ্ধ এবং কণ্ঠস্বর ছিলো মাধুর্যমণ্ডিত।

আমার প্রথম গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন *মুক্তধারা* (১৯৯০)। প্রকাশের জন্যে প্রদত্ত পাণ্ডুলিপি প্রকাশযোগ্য কিনা তার মূল্যায়ন বা মতামতার জন্যে চিত্তরঞ্জন সাহা দুজন রিভ্যুয়ারের কাজে পাঠাতেন। আমার উল্লিখিত বইয়ের রিভ্যুয়ার ছিলেন নাজমা জেসমিন চৌধুরী ও আবুল হাসনাত। দুজনই বইটি প্রকাশের সপক্ষে মতামত দেন। একদিন হাসনাত ভাই বলেন, আপনার মুনীর চৌধুরী ওপর কাজটি ভালো হয়েছে (*মুনীর চৌধুরী সাহিত্যকর্ম*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা একাডেমী)। এমন মন্তব্য হাসনাত ভাই এর কাছ থেকে পাওয়া অপ্রত্যাশিত। তিনি আরও বলেন, মুনীর স্যারের কয়েকটি নাটক সম্পর্কিত আলোচনা তথ্যনির্দেশিকা বাদ দিয়ে, কিছুটা কেটেছেঁটে সংবাদ সাময়িকীর জন্যে দিতে পারেন। আমি *কবর*, রক্তাক্ত প্রান্তর ও *চিঠি* নাটক তাঁর চাহিদা মতো জমা দিই। তিনি যত্ন নিয়ে নাট্যপ্রবন্ধের শিরোনাম সুন্দর লেটার ইলাস্টেশন করে ছাপেন। শেষোক্ত নাটক দুটি আলোচনা বড় হওয়ায় পর পর দুসপ্তাহ ছাপতে হয়। তিনি আমাকে দিয়ে কিছু ব্যতিক্রমি প্রবন্ধ লিখিয়েছেন। একজন লেখকের যে মূল লেখা, তার বাইরেও তিনি কিছু ভিন্নধর্মী লেখা লিখেন। সে-বিষয় নিয়েই তিনি আমাকে লিখতে বলেন। যেমন, সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধ– কাজী হাসান হাবীবের কবিতা, রণেশ দাশগুপ্তের নাটক : ফেরী আসছে, আবুল হাসানের নাটক, ঋত্বিক ঘটকের গল্পে নিসর্গজীবন, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কবিতায় সত্য ও সুন্দরের রূপায়ণ প্রভৃতি।

হাসনাত ভাই অন্যের লেখা ছেপে তৃপ্তি পেতেন। নিজের লেখা ছাপার আগ্রহ খুব একটা দেখাতেন না। অথচ যে কোনো সম্পাদক-প্রকাশক তাঁর লেখা ছাপতে অনীহা প্রকাশ করার কথা নয়। কারণ, মাহমুদ আল জামান নামে লেখা তাঁর কবিতা এবং আবুল হাসনাত নামে লেখা গদ্যপ্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও চিত্র-আলোচনা কম শিল্পসম্পূন্ন নয়। তাঁর *নির্বাচিত কবিতা*, *প্রত্যয়ী স্মৃতি ও অন্যান্য* এবং *হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে* গ্রন্থ তিনটি সে-সত্যের প্রমাণ দেয়।

ছাত্রজীবনে হাসনাত ভাই দাপটের সাথে প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন। উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে এসে, সাহিত্য সম্পাদকের কাজ করতে গিয়ে সেই প্রগতিপন্থী চেতনা ম্রিয়মান হয় নি, বরং জহুর হোসেন চৌধুরী, আহমেদুল কবির, শহীদুল্লা কায়সার, রণেশ দাশগুপ্ত, বজলুর রহমান, সন্তোষ গুপ্ত প্রমুখ মনীষীর সাহচর্য তাঁকে সর্বদা মানবিক কল্যাণ ও সততার পক্ষে জাগ্রত রেখেছে।

তিনি যেমন সব পত্রপত্রিকায় লিখতেন না, তেমনি সব সাহিত্যানুষ্ঠান কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উৎসব-আয়োজনে যেতেনও না। বাংলা একাডেমির সাধারণ সভায় মাঝেমধ্যে গেলেও আনমনে ঘুরেফিরে দেখতেন-অন্যরা আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করতেন। কখনো দেখতাম, সভা পেন্ডেলের একেবারে পিছনে গিয়ে বসতেন, সামনের সারিতে জায়গা দখলের বাসনা তাঁর কখনোই ছিলো না। একবার কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে আন্তঃক্যাডেট কলেজে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তাঁকে বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সরাসরি বলেন– বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক নিয়ে যান। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়, নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আস্থা-বিশ্বাসের সহজাত প্রকাশ। আবুল হাসনাত *সংবাদ* ছেড়ে *কালি ও কলম* পত্রিকার সম্পাদক হোলেন। নতুন মাসিক শিল্প সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। প্রকাশক শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিপ্রিয় আবুল খায়ের। ২০০৪ সাল, আমি তখন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে। সাহস করে ফোনে হাসনাত ভাইকে বললাম, ঠিক আছেন তো? চিন্তা করবেন না। শিল্পরসিক প্রকাশক আবুল খায়ের ও সভাপতি আনিসুজ্জামান স্যার আছেন। তিনি শুধু বললেন, পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করে দেন। কুমিল্লা থেকে ফেনী, ঝিনাইদহ, জয়পুরহাট হয়ে পাবনা ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ, অতঃপর অবসর নিই। যেখানেই গেছি বা আছি উপযুক্ত কাউকে পেলেই *কালি ও কলম* পত্রিকার গ্রাহক করে দিয়েছি। এখন এটা দেশের সেরা সাহিত্য পত্রিকা। হাসনাত ভাইয়ের মৃত্যুর পর বুক সেল্ফ থেকে *কালি ও কলম* নামিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ছাড়া বিশ বছরের পত্রিকা আমার কাছে আছে। সংবাদ সাময়িকীর অভিজ্ঞতা আবুল হাসনাত এখানে প্রয়োগ ও নবতর চেতনা-পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিয়েছেন। কবিতা, নাট্যকলা ও

শিল্পের পাতাগুলো রঙের আভিজাত্যে হয়েছে মনোমুগ্ধকর। লেখার প্রয়োজন অনুযায়ী সংযুক্ত হয়েছে প্রাসঙ্গিক ছবি। প্রায়ই সব সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পির অংকিত চিত্র দিয়ে নির্মিত এবং অধিকাংশ ছবির সাংগ্রাহক আবুল খায়ের। হাসনাত ভাই *কালি ও কলম* - এ লেখার তাগাদা না দিলে আমার লেখা হতো না মুনীর চৌধুরীর নাটক ও উত্তরপ্রজন্ম, জিয়া হায়দার : আধুনিক নাটকের বিশিষ্ট্য রূপকার, আবুবকর সিদ্দিক : বহুমুখী প্রতিভার প্রতিভূ, আব্দুল মান্নান সৈয়দের নাট্যসাহিত্য, মোবারক হোসেন খান : শিল্পসাহিত্যের বরেণ্যজন প্রভৃতি প্রবন্ধ। স্মরণসংখ্যা, স্মারকসংখ্যা, শ্রদ্ধাঞ্জলি ক্রোড়পত্র ছাড়াও বর্ধিত কলেবরে প্রতি বছর ছোটগল্প ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিশেষ সংখ্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সার্ধশতজন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, শামসুর রাহমান, জয়নুল আবেদিনজন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি, কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রকলা, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর, মোহাম্মদ কিবরিয়া, হুমায়ূন আহমেদ, আমিনুল ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম ও নবনীতা দেবসেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি, আনিসুজ্জামান এবং ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মদ্বিশতবর্ষ ক্রোড়পত্র। বিদ্যাসাগর সংখ্যাটিই আবুল হাসনাত সম্পাদিত শেষ *কালি ও কলম*। প্রতিটি সংখ্যায় তাঁর শ্রমসাধনা, নান্দনিক দৃষ্টি ও নতুনতর সৃষ্টির স্বাক্ষর আছে। যোগ্যতা গুণেই তিনি *শিল্প ও শিল্পী* পত্রিকা সম্পাদক এবং বেঙ্গল পাবলিকেশনের নির্বাহী পরিচালক হয়েছিলেন।

আমি খুব সীমিত সময়ের জন্যে *দৈনিক বাংলা*র সম্পাদক আহসান হাবীব ও সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র সম্পাদক শামসুর রাহমানের স্নেহধন্য হতে পেরেছিলাম। কিন্তু সম্পাদক আবুল হাসনাতের সান্নিধ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর। আজ সংবাদ সাময়িকী কিংবা *কালি ও কলম*-এ চোখ রাখলেই ভেসে ওঠে এক শান্তস্নিগ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত সম্পাদকের মুখশ্রী– তিনি লেখক-পাঠকদের আপনজন, প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন আবুল হাসনাত।

• ফিরে দেখা

বার্ষিক সাধারণ সভা
২ মার্চ, ২০২৪
সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

শুভ সকাল॥

আশা করছি আপনারা সকলেই কুশলে আছেন।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাই। বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের বয়স আট বছর। আট বছরের অগ্রযাত্রায় আমরা চতুর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২৩-২৪) দায়িত্ব গ্রহণ করি গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের ভেতর দিয়ে। বিদ্যমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এক বছর পর সাধারণ সভা আয়োজনের কথা থাকলেও সেটি সম্ভব হয়নি। গঠনতন্ত্রের বাধ্যবাধকতা মেনে গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের কারণে আমাদের পক্ষে সেটি করা সম্ভব ছিল না। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদ ও বর্ধিত সভায় আমাদের লক্ষ্য ছিল গঠনতন্ত্রের সংশোধনের বিষয়টি দৃঢ়ীকরণ, আয়-ব্যয়ের হিসাবের অডিট উত্থাপন ও অনুমোদন, স্থিত অব্যয়যোগ্য তহবিল ও ব্যয়যোগ্য তহবিলের হিসাব পর্যালোচনা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে স্বাক্ষর পরিবর্তন করা। অব্যয়যোগ্যা স্থায়ী আমানতের স্বাক্ষর যুক্তকরণের জরুরি কাজটি সম্পন্ন করা। এগুলো প্রত্যেকটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই মেয়াদে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সদস্য তালিকার হালনাগাদকরণ, যথারীতি সদস্য সংগ্রহ অভিযান, সদস্য পরিচিতি আপডেটকরণ প্রভৃতির পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেল খোলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম, সেমিনার করার উদ্যোগের কথা বলা হয়। আমরা দুটো সেমিনারের আয়োজন করেছি। এবং এর পাশাপাশি প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়েছে। ডকুমেন্টেশন, প্রদর্শনী, আইসিটি কার্যক্রম বৃদ্ধি চলমান রয়েছে। আপনারা আজকের এ অডিটোরিয়ামের বাইরে যে প্রদর্শনী, মঞ্চের সাইডবারে যে ডকুমেন্টেশনের প্রদর্শনী দেখছেন এসব তারই অংশ। ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ বরেন্দ্র কলেজ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় বিভিন্ন বিভাগীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজশাহী শাখা কমিটি গঠন করা হয়। পরে এই শাখা কমিটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তীতে আরও ঢাকা ও খুলনা বিভাগীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। রংপুর বিভাগীয় কমিটি গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে ঢাকা কমিটি ও রাজশাহী কমিটির কার্যক্রম অডিটরিয়ামের বাইরের স্টলে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং সদস্য পদ বৃদ্ধি, জীবন সদস্য তৈরিতে তাদের ভূমিকা অনবদ্য। আজ এখানে, বিভিন্ন ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ও ট্রেজারার তাঁদের কার্যক্রমের কথা আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই গত একবছরে বিভিন্ন সময়ে আইটি, ক্যারিয়ার উন্নয়ন, বিসিএস প্রস্তুতি ও অনুশীলন বিষয়ে কর্মশালা করেছে। একটি প্রবন্ধ-বিষয়ক স্যুভেনিরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের

কাজ চলমান। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় ইতিহাস রচনার কাজ নিয়ে জ্যেষ্ঠ অ্যালামনাস ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ চলছে। তৃতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ঢাকাস্থ সভায় গঠনতন্ত্র পরিমার্জন ও নতুন সদস্য করা নিয়ে আলোচনা হয়। এবং ব্যাচ-ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়। বিভাগীয় কমিটির জন্য গঠনতান্ত্রিক কিছু সংশোধনীরও প্রস্তাব আসে। চতুর্থ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ অক্টোবর ২০২৩, রাজশাহীতে। এতে ঢাকা ও রাজশাহী কমিটির বিভিন্ন কাজের অনুমোদন এবং তাঁদের নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মযোগের প্রশংসা করা হয়। এ কমিটি দায়িত্বগ্রহণের পর অব্যয়যোগ্য স্থায়ী আমানতে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করার কথা ট্রেজারার অবহিত করেছেন। অ্যালামনাইয়ের মাননীয় ট্রেজারার ব্রাইনির ইসলাম তার প্রতিবেদনে সে-বিষয়ে এখানে আজ বিস্তারিত বলেছেন। গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকায় কার্যনির্বাহী পরিষদের পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বার্ষিক সাধারণ সভার আজকের তারিখ (০২ মার্চ ২০২৪)টি নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ সদস্যদের পদ অবলুপ্ত করে জীবন সদস্য করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দ্রুততর সময়ে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, জীবন সদস্যদের জন্য তালিকাভুক্ত গ্রন্থ আপডেটকরণ এবং গঠনতন্ত্র পরিমার্জন, সংশোধন ও সম্পাদনার কাজটি জরুরি বলে মনে করা হয়। এবং সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনায় আগামী দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এটি প্রত্যেক সদসদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজটি বদ্ধপরিকর বলে মনে হয়। একই সাথে প্রত্যেক সদস্যদের ডিজিটাল কার্ড প্রদানের বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটিও কর্মপরিকল্পনার জরুরি অংশ। ওয়েবপেজ আপডেট, ফেসবুকপেজ তৈরি এবং আমাদের শিক্ষক প্রবীণ অ্যালামনাস কবি আবুবকর সিদ্দিকের জন্য স্মরণসভা ও এতদ্‌সঙ্গে এর ব্যয় অনুমোদন হয় এ সভায়। এ স্মরণসভাটি জাতীয়ভাবে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবং এটি আমরা ঢাকায় জাতীয়ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

গত ৫টি কার্যনির্বাহী সভা, তিনটি ওয়ার্কশপ, ওয়েবপেজ নবায়ণ, ডিসপ্লে কার্যক্রম, বিভাগীয় কমিটি গঠন ও তাদের কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় সমর্থন দেওয়া ছাড়াও আগামী কর্মপরিকল্পনায় সকল জীবন সদস্যদের আইডি কার্ড প্রদান, স্যুভ্যেনির করা, প্রত্যেক অ্যালামনাসের বইপুস্তক ও কাজের প্রদর্শনী, আপডেটেড সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের এসব কর্মউদ্যোগ একপ্রকার ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনারই অংশ। আপনাদের সহায়তায় এ কার্যক্রম আরও বেগবান হবে এবং অ্যালামনাইয়ের গতিশীল নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনটিই কামনা করি।

আপনাদের সকলের জীবন কল্যাণ ও মঙ্গলময় হোক। একই সঙ্গে আমাদের নিকট থেকে যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার চিরপ্রশান্তি কামনা করি।

ধন্যবাদ সকলকে–

শহীদ ইকবাল
সাধারণ সম্পাদক

বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় **২ মার্চ ২০২৪ শনিবার** সকাল ৯-০০ টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার টিএসসিসি মিলনায়তনে। প্রাণবন্ত পরিবেশের প্রাঙ্গণটি সাজানো হয়েছিল বুক স্টল, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির প্রদর্শনী ক্ষেত্র, রেজিস্ট্রেশন বুথ, সিনিয়র অ্যালামনাসদের আড্ডা-স্থাপনা, উন্মুক্ত প্যান্ডেলে আড্ডা আর মিলনায়তনের ভেতরে শুরু হয়েছিল সাধারণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। আড়াইশ'র অধিক রেজিস্ট্রার্ড সদস্য এতে অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯-০০ টা থেকেই টিএসসিসি-কে ঘিরে শত শত অ্যালামনাস এক বর্ণিল পরিবেশ পেয়ে যায়। সকালে শুরু হয় রেজিস্ট্রেশন ও টোকেন সংগ্রহ। এবং সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও গঠনতন্ত্র সংশোধনীর কপি সকল সদস্যদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। অ্যাল্যামনাইয়ের রীতি অনুযায়ী কার্যনির্বাহী সদস্য আবদুল খালেক মিঠুর সকালের নাশতা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সাইদুল আম্বিয়া বিকেলের নাশতা এবং অ্যালামনাইয়ের সাধারণ সম্পাদক শহীদ ইকবাল লাঞ্চের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে খাবারের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সকাল ১১-০০টা নাগাদ শুরু হয় অ্যালামনাই সাধারণ সভা। প্রথমে আসন গ্রহণ এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পেশ। অতঃপর মুক্ত আলোচনা। মুক্ত আলোচনার পরই পূর্বাপর গঠনতন্ত্রের সংশোধন এবং পরিমার্জন বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের বিবরণী পেশ করা হয়। সাধারণ সম্পাদকের বিবরণীতে গঠনতন্ত্রের মৌলিক কিছু পরিবর্তন উত্থাপন করা হয়। যেমন, সভাপতি নির্বাচিত হবে ঢাকা থেকে তাহলে সাধারণ সম্পাদক হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে একইভাবে সাধারণ সম্পাদক ঢাকা থেকে হলে সভাপতি হবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে, এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে সাধারণ সভা করা না গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা, ঢাকা-রাজশাহী-খুলনা বিভাগীয় কমিটি ২৫ সদস্যবিশিষ্ট করা কিংবা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে কমপক্ষে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটির কাজ চালানো, অ্যালামনাইয়ের পুরস্কার প্রভৃতি পরিমার্জনা ও সংশোধনের ভেতর দিয়ে আগামী দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একটি পরিচ্ছন্ন গঠনতন্ত্র মুদ্রণের প্রস্তাব করা হয়। সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। কিছু পয়েন্টে দুজন সদস্য ভিন্নমত দিলেও হাউজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন পায়। এরপর বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টাগণ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি আপেল আবদুল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক পিএমসফিকুল ইসলামসহ বর্তমান সভাপতি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক রাশেদা খালেক সম্পাদিত ও মুদ্রিত 'স্বপ্নের মতিহার' স্যুভেনিরের পাঠ-উন্মোচন করা হয় এবং বক্তব্য রাখেন। ঢাকা-রাজশাহী-খুলনা বিভাগীয় কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের কর্মপরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। প্রত্যেককেই অ্যালামনাই সুগঠিত ও সুসংহত করার দিকনির্দেশনা দেন এবং এটি সম্মুখের দিকে এগিয়ে নেওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সাধারণ সম্পাদক বাংলা বিভাগীয় সেমিনারে একটি 'অ্যালামনাই কর্নার' করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া অব্যয়যোগ্য স্থায়ী ফান্ডে শিগগীরই অতিরিক্ত আড়াই লক্ষ টাকা জমাদানের কথা কোষাধ্যক্ষ মহোদয় উল্লেখ করেন– তাতে বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি মোট পাঁচলক্ষ টাকা অব্যয়যোগ্য ফান্ডে জমা প্রদানের সামর্থ্য ও অভিমত ব্যক্ত করেন। বস্তুত,

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ে এখন আর সাধারণ সদস্য না-থেকে সকলেই হবেন জীবন সদস্য। এবং অ্যালামনাই সদস্য সংখ্যা অর্থাৎ জীবন সদস্য বৃদ্ধির ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়। কার্যত এটি নিরন্তর অব্যাহত থাকবে বলে সকলেই একমত পোষণ করেন।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর আবদুল খালেক অভিভাষণ দেন অতঃপর অ্যালামনাই সভাপতি সকলের মঙ্গল কামনা করে সাধারণ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাধারণ অধিবেশনের পর পরই দুপুরের খাবার অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অ্যালামনাসদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিকেলের নাশতা গ্রহণের ভেতর দিনের কর্মসূচির সমাপ্ত ঘোষণা হয়।

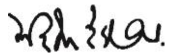

সাধারণ সম্পাদক
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই

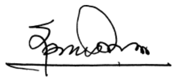

সভাপতি
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই

বাংলা গবেষণা সংসদ পরিচিতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের একটি ঐতিহ্যবাহী অঙ্গসংগঠন হচ্ছে 'বাংলা গবেষণা সংসদ'। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৬। ১৯৫৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে বাংলা বিভাগ যাত্রা শুরু করে। এই যাত্রাপথের নকিব ছিলেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সাহিত্যের গবেষণার বিষয়টি নিশ্চিত করবার মানসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের মাথায় গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করবার চিন্তার জন্ম নেয়। বাংলা বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের মুখপত্র হিসেবে 'সাহিত্যিকী' নামে গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় শরৎ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে। ড. মযহারুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির ভূমিকায় সম্পাদকের প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে শরৎ ও বসন্ত নামে চিহ্নিত হয়ে দুটো করে সংখ্যা প্রকাশিত হবে। তবে নানা কারণে পত্রিকাটি তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি। প্রথম সংখ্যা শরৎ ১৩৬৬ থেকে ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মোট ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রথম সংখ্যা থেকে সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (বসন্ত ১৩৭৬) পর্যন্ত মোট ১০টি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর মযহারুল ইসলাম। দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শরৎ ১৩৮৯ থেকে ত্রয়োদশ বর্ষ ১৩৮২/৮৩ পর্যন্ত প্রকাশিত তিনটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর কাজী আবদুল মান্নান। কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত 'সাহিত্যিকী'র শেষ সংখ্যাতেও প্রচ্ছদের ওপরে লেখা হয়েছে 'বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'। ১৯৭৬ সালে 'বাংলা গবেষণা সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সাহিত্যিকী' সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় বিভাগীয় সভাপতির ওপর। 'সাহিত্যিকী'র বিভাগীয় পত্রিকা না হয়ে বাংলা গবেষণা সংসদের পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গবেষণা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে 'সাহিত্যিকী'র প্রথম সংখ্যাটি (১৪শ বর্ষ, শরৎ সংখ্যা, ১৩৮৪) প্রকাশিত হয় তৎকালীন বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর গোলাম সাকলায়েনের সম্পাদনায়। এ সংখ্যার প্রচ্ছদে উল্লিখিত হয় 'বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'। এ সংখ্যা থেকে 'সাহিত্যিকী'র আকার বুক সাইজে পরিবর্তিত হয়। গবেষণা সংসদের গঠনতন্ত্রে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : ক. বাংলা বিভাগের গবেষণার কাজে সহায়তা খ. বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী'র স্থায়ী তহবিল গঠন গ. বিভাগে শিক্ষকগণের গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সংকলন, মুদ্রণ ও প্রকাশন ঘ. বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধন। গবেষণা সংসদ সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষে নানা সময়ে এ সংসদ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৭৬ সালের ১ জুলাই বাংলা গবেষণা সংসদের উদ্যোগে তিনটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এগুলো হচ্ছে : বাংলা কবিতা সংকলন, বাংলা ছোটগল্প সংকলন ও বাংলা প্রবন্ধ সংকলন। বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষক গবেষণা সংসদের সদস্য। জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক সংসদের সভাপতি এবং দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই সূত্রে তিন সংকলনই পৃথক পৃথক সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছিল। এই তিনটি সংকলন দীর্ঘদিন বি.এ. শ্রেণির পাঠ্যভুক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যিকী' ছাড়াও বাংলা গবেষণা সংসদ থেকে সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য 'কৌষিক' নামে একটি সৃজনশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর কাজী আবদুল মান্নান এবং যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে পত্রিকাটির প্রথম

সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। এছাড়াও 'বাংলা গবেষণা সংসদ' থেকে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রফেসর সারোয়ার জাহান সম্পাদিত *বঙ্কিম-বিভূতি-ওদুদ* (১৯৭৮), ড. অমৃতলাল বালা সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* (১৯৯৯), *সারোয়ার জাহান স্মারকগ্রন্থ* (২০০৭), *আসাদুজ্জামানের নির্বাচিত কবিতা* (২০১০), বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মারক সংকলন *আমি কে তা মনে রেখ* (২০১০)।

বাংলা গবেষণা সংসদের কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সেটি হচ্ছে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতবর্গের বক্তৃতার আয়োজন। এ সংস্থার আমন্ত্রণে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ড. ভবতোষ দত্ত, ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ, ড. অমলেন্দু দে, ড. মযহারুল ইসলাম, ড. মঞ্জুলী ঘোষ, অশ্রুকুমার সিকদার, গোলাম মুরশিদ প্রমুখ। বাংলা গবেষণা সংসদের উদ্যোগে 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শীর্ষক বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার। সেমিনারে পঠিত গ্রন্থসমূহ নিয়ে গবেষণা সংসদ প্রকাশ করে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির অর্জন* (২০২১) শীর্ষক গ্রন্থ। গত ২৫ এপ্রিল ২০২৪ মধুসূদনের দ্বিশতজন্মবর্ষ আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজনের সার্বিক উদ্‌যোগও এ সংগঠনের। ইতোমধ্যে বাংলা গবেষণা সংসদ হতে আরও বেশ কিছু কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যে কাজগুলো পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলছে।

[পুনঃমুদ্রিত]

বাংলা বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পঠনপাঠন ও উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৫৪-৫৫ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। এ বিভাগের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৫ সালের ১লা নভেম্বর। জ্যেষ্ঠতার তালিকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্থান ষষ্ঠ। ১৯৫৫-৫৬ থেকে বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয় সংস্কৃত বিভাগ। এর ফলে বিভাগের নামকরণ হয় 'বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ'। সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে প্রাচ্যের দুটি মৌলিক ভাষার সমন্বয়ে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় উপমহাদেশের ভাষাবিদ, পণ্ডিত, গবেষক, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ওপর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বরেন্দ্র অঞ্চলের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষের সুপ্তবাসনা ও দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল এ বিভাগ। এ ছাড়া এর পশ্চাতে রয়েছে সহস্রাধিক বছরের ক্রমবিবর্তিত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণসূত্রতা। প্রতিষ্ঠাপর্বে বাংলা বিভাগের পাঠদানকার্য শুরু হয় এম. এ. পূর্বভাগের চারজন শিক্ষার্থী নিয়ে। বিভাগের জন্মলগ্নে বিভাগীয় অধ্যক্ষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন রাজশাহী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বাংলার অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে বিভাগের যাত্রা শুরু হলেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিলম্ব ঘটেনি। বিভাগ প্রতিষ্ঠার দেড়মাসের মধ্যেই অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ আবদুস সাত্তার। জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে বিভাগের তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক মযহারুল ইসলাম। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভাগে যোগদান করেন মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী আবদুল মান্নান, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম পিএইচ. ডি. ডিগ্রি করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হেয়াত মামুদ : তুলনামূলক আলোচনা'। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। ষাটের দশকে বাংলা বিভাগের শিক্ষাকার্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৬১-১৯৬২ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুবছর মেয়াদী অনার্স ৩ বছর মেয়াদে উন্নীত হয়। ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এম. এ. পূর্বভাগ বিলুপ্তি এবং সম্মান শ্রেণিতে সমন্বিত কোর্স চালু হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ থেকে চার বছর মেয়াদী অনার্স পাঠক্রম চালু হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। ২০০৫ সালের নভেম্বরে বিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হয়। বাংলা বিভাগের অধীনে 'বাংলা গবেষণা সংসদ' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রায় প্রতিবছর এ গবেষণা সংসদ থেকে *সাহিত্যিকী* নামের গবেষণা জার্নাল বের হয়। এ পর্যন্ত সাহিত্যিকীর ৫৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণা সংসদ দেশি-বিদেশি ব্যক্তিদের নিয়ে সেমিনার এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক-লেখকদের ঘিরে জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ২০২২ সালে বাংলা গবেষণা সংসদ কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এবং কবি আবুল হোসেনের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করেছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাতিরিক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে 'বাংলা সমিতি'। বাংলা সমিতি বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই প্রথম বর্ষে নবীন বরণ ও শেষ বর্ষের বিদায় অনুষ্ঠানের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া বিভাগের নবীন-প্রবীন কৃতী শিক্ষকদের

নিয়েও অভিষেকের ব্যবস্থা করে। গবেষণা সংসদ এবং বাংলা সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদিত পঞ্চাশ বছরের অধিক বয়সী পুরনো সংগঠন। বাংলা বিভাগে রয়েছে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই। ক্রমবর্ধমান আটশ সদস্যের অ্যালামনাই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন করে থাকে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে থাকে। বাংলা বিভাগের সুবিশাল সেমিনার কক্ষে প্রয়াত শিক্ষক যথাক্রমে প্রফেসর মজিরউদ্দিন মিয়া, প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, অধ্যাপক এস এম আবদুল লতিফ কর্নার এবং 'বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই কর্নার' সুরক্ষিত রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ মূলত বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চার বিভাগ। এখানে পঠন-পাঠনের জন্য গৃহীত অধিকাংশ কোর্সই বাংলা সাহিত্য-সম্পর্কিত। সাহিত্যের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত বিচার-বিশ্লেষণই এর লক্ষ্য। এমনটা করতে গিয়ে একজন শিক্ষার্থীর বিচিত্র বোধ ও চিন্তন-কাঠামো সৃজন, বিকাশ ও উচ্চতর ধারণা নির্মাণের বহুমুখী প্রয়াস থাকে। তাই প্রতিটি কোর্সেরই উপযোগ ও কার্যকারিতার তাৎপর্যপূর্ণ অভিমুখ এখানে বিশ্লিষ্ট। সাহিত্য-পাঠ যেহেতু মানববিদ্যার বিস্তৃত ও রূপান্তরশীল জ্ঞানকেন্দ্র– তাই সেখানে সমাজ-সম্পৃক্ততা বা সমাজ-ইতিহাসের পাঠ অনিবার্যভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী মানস গঠন ও তার সর্বশেষ তথ্যের আলোকে নিজের চিন্তা ও ভাবনাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এ পর্যায়ে তৈরি হয়। এ পাঠক্রমে সে প্রক্রিয়ার ওপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই সাহিত্য ও সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন রকমের কোর্সের সংযোজন ও রূপান্তরকরণ এবং বিশ্লেষণ প্রয়াস এতে রয়েছে। বস্তুত, সাহিত্যের পাঠকে উপজীব্য করে তুলনামূলক চিন্তার বিচার বিশ্লেষণ ও সমাজ-ইতিহাস অনুষঙ্গী মনন সৃজন কাঠামো নির্ণয়– যা একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতামূলক ও যুগোপযোগী করে তুলতে পারে এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্র-প্রস্তুত করে– তারই উদ্যোগ এতে পরিগৃহীত। এমন পঠন-পাঠন শিক্ষার্থীকে একাধারে চলতি সমাজের নির্মিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন ধারণা দেয়, তেমনি হালনাগাদ সমাজ-ইতিহাসের চিন্তাধারণাকেও প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলা সাহিত্য পঠনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক ডিসকোর্স ভাষা ও ধ্বনির গঠন ও পুনর্গঠন, ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য, তথ্যপ্রযুক্তির প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, সংবাদতথ্য, সৃজনশীলতা, চলচ্চিত্রবোধসহ বিচিত্র বিষয়ক জ্ঞানধারণা এ পাঠক্রমে অঙ্গীভূত হয়েছে। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রগতিচেতনা, আত্মবিশ্বাস, কর্মদক্ষতা, গবেষণা ও উচ্চতর জ্ঞান-নির্ণায়ক সামূহিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আত্মশক্তি পাঠক্রমটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য– যা তাদের পরিপূর্ণ জীবন ও মানস গঠনের সহায়তা দিতে সক্ষম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ চার বছরের স্নাতক শেষ করার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। মূলত, এ পর্বে সাহিত্যিকের জীবনদর্শন ও গবেষণা-অনুষঙ্গী পাঠদানই করা হয়। এখানে গৃহীত অধিকাংশ কোর্সই বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত। স্নাতক-পর্যায়ের উচ্চনম্বরধারী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ আলাদা গ্রুপে এখানে গবেষণাপত্র (ডিসার্টেশন) করতে পারে। কার্যত, উচ্চতর গবেষণার প্রাথমিক অন্বেষার অনুসন্ধান এ শ্রেণিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলা বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু হয়েছে। বর্তমানে ১৪৮ ক্রেডিটের অনার্স কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়েও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতির পাঠদান অনুমোদিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিভাগীয় করিকুলাম প্রণয়নে অ্যালামনাস এবং এমপ্লয়িগণ বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেত গবেষণায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অবদান উজ্জ্বলই বলতে হয়। এ বিভাগ থেকে অদ্যাবধি সত্তরের অধিক এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলা বিভাগের কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ২১, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৭ জন। ১৯৭৩র অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বর্তমানে বিভাগের ২৫ তম সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর শহীদ ইকবাল।

[ঈষৎ পরিমার্জিত]